PG Education 8 (E4)
Module 2

একক 6 ❑ পরিবেশ শিক্ষার ধারণা (Concept of Environmental Education)

গঠন

6.1 সূচনা

6.2 উদ্দেশ্য

6.3 পরিবেশ শিক্ষার অর্থ

6.3.1 পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা

6.3.2 পরিবেশ শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

6.4 পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি

6.5 পরিবেশ শিক্ষার পরিধি

6.5.1 পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু

6.5.2 পরিবেশ শিক্ষা ও অন্যান্য বিজ্ঞান

6.5.3. পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা

6.6 পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য

6.6.1 প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য

6.6.2 পরোক্ষ উদ্দেশ্য

6.7 সারসংক্ষেপ

6.8 প্রশ্নাবলি

6.1 সূচনা (Introduction)

পরিবেশই মানব সভ্যতার প্রকৃত ধাত্রী। প্রথম প্রাণের সূত্রপাত যে ভৌত পরিবেশে ঘটেছিল, সেখান থেকেই ধাপে ধাপে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হল জৈব পরিবেশ। মানুষ এল সবার শেষে, শুরু হল তার প্রকৃতিকে জয় করার লড়াই, প্রবল প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় ক্ষুদ্র মানব সম্প্রদায়ের আপ্রাণ বেঁচে থাকার চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে মানুষ যতই শক্তিশালী হতে থাকল ততই পিছু হঠতে শুরু করল প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের নেশায় মানুষ প্রকৃতির মৌলিক রূপ নিজের মত করে পরিবর্তন করে নিয়ে আরও স্বাচ্ছন্দ্য, আরও আরামের সন্ধানে ধ্বংস করতে শুরু করল নিজেরই ধাত্রী পরিবেশকে। গৃহনির্মাণ, নগরায়ণ, সুখভোগের নানা উপকরণ যোগানোর জন্য অগণিত কল কারখানা, তাদের বর্জ্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, নির্বিচারে ভূগর্ভের জল তোলা, প্রাকৃতিক সম্পদ বেপরোয়া ভাবে নষ্ট করা, বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করা, এই সবের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল অস্তিত্বের সংকট। প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, দাবানল, প্রভৃতি বিপর্যয় এবং

সেই সঙ্গে মারণ রোগের বিস্তার, জনসংখ্যার লাগামছাড়া বৃদ্ধি এই সব বিষয়ে কিছুটা চেতনা জাগ্রত হল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন মানব সভ্যতা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং পরিবেশ দূষণ ও প্রকৃতি ধ্বংস হাত ধরাধরি করে, আমাদের এক অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এই উপলব্ধি থেকেই শুরু হল পরিবেশ সচেতন বিজ্ঞানী ও অন্যান্য মানুষের আলাপ আলোচনা, সভা সমাবেশ, পুস্তক রচনা, গবেষণা ও নানাভাবে পরিবেশ বাঁচানোর সক্রিয় চেষ্টা। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানের শাখা থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান একত্রিত করে জন্ম হল পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) নামক বিদ্যাচর্চার এক নতুন শাখার। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে পরিবেশ সংরক্ষণের চেষ্টা শুধু মাত্র কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। নির্বিচারে সমস্ত মানুষকে তার অংশীদার করতে হবে। আর সর্বস্তরে পরিবেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এই কাজ সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ শিক্ষা (Environmental Education) নামক শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় তৈরি হল। বর্তমান পাঠ্যাংশে পরিবেশ শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে। শুরুতে পরিবেশ শিক্ষার একটি প্রাথমিক ধারণা নিয়ে তার পর পরবর্তী অংশের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হবে।

6.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ শিক্ষার—

- অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা করতে পারবেন।
- সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

6.3 পরিবেশ শিক্ষার অর্থ (Meaning of Environmental Education)

মানুষ পরিবেশের কোলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মাতৃগর্ভে ভিন্নতর পরিবেশে লালিত হয়। জন্ম পরবর্তী পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয় সেখানেই। নিজের অজ্ঞাতে সদ্যোজাত শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বড় হতে থাকে। পরিবেশ সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সুস্থ চেতনা থাকলেও পরিবেশকে সে ততটাই জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করে যতটা তার নিজের জন্য প্রয়োজন। সেজন্য পরিবেশের নানা বিচিত্র রূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা কখনোই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানে পরিণত হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবেশ সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান নিয়েই তাদের জীবন কেটে যায়। তারা তাৎক্ষণিক সুখ ও আরামের জন্য নানাভাবে পরিবেশকে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ধ্বংস করতে দ্বিধা করে না। পরিবেশ শিক্ষার তাৎপর্য এখান থেকেই শুরু।

ইংরাজী Environmental Education এর সঠিক বঙ্গানুবাদ পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা যা পরিবেশ শিক্ষার একটি অংশ মাত্র। সেজন্য অনেক গ্রন্থকার Environment Education কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। কারণ পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা কথাটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে তা প্রায় সাধারণ শিক্ষার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মানুষের সমস্ত শিক্ষাই কোনও না কোন ভাবে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলায় পরিবেশ শিক্ষা (Environment Education) নামক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

- পরিবেশের জন্য শিক্ষা (Education for the environment)
- পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষা (Education within the environment)
- পরিবেশের সাহায্যে বা মাধ্যমে শিক্ষা (Education by or through the environment)

অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু পরিবেশ. সেই শিক্ষা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (যেমন, শুধুমাত্র বই পড়ে) লাভ করা যায় না এবং পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম উপাদান, পদ্ধতি বা শিক্ষক পরিবেশ নিজেই। পরিবেশ শিক্ষার এই মৌলিক অর্থটির উপর ভিত্তি করে এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে।

6.3.1 পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য এবং সম্ভবত প্রথম সংজ্ঞা দিয়েছিলেন UNSCO'র উদ্যোগে The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 1970 সালে। প্যারিসে অনুষ্ঠিত তাদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভায় (International Working Meeting on Environmental Education in the School Curriculum) বলা হয়।

মানুষে মানুষে, তাদের কৃষ্টি ও জৈব-ভৌতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে বোঝা ও উপভোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রতিন্যাসের বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশে উপযুক্ত মূল্যবোধ চিহ্নিত করা ও ধারণাগুলির ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া হল পরিবেশ শিক্ষা। পরিবেশের গুণমান বজায় রাখার জন্য নিজের মত করে আচরণবিধি তৈরি করা ও তাকে কাজে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণও পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

("Environmental education is the process of recognizing values and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and his biophysical surroundings. Environmental education also entails practice in dicision making and self-formulation of a code of behaviour about issues concerning environmental quality")

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিল মনে হলেও এর মধ্যে পরিবেশ শিক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যার পূর্বে The Finish National Commission (1974)-এর বক্তব্যটিও উল্লেখ করা দরকার।

পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার একটি পদ্ধতি। পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা বা চর্চার বিষয় নয়। জীবনব্যাপী সমন্বিত শিক্ষার নীতি অনুযায়ী এই শিক্ষা বজায় রাখা দরকার।

("Environmental education is a way of implementing the goals of environmental protection. Environmental education is not a separate branch of science or subject of study, it should be carried out according to the principle of lifelong integral education")

এছাড়াও 1977 সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার জর্জিয়াতে অনুষ্ঠিত UNESCO'র

Tbilisi Conference-এ (UNEP বা United Nation Environmental Programme আয়োজিত) পরিবেশ শিক্ষার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সেখানে পরিবেশ শিক্ষার একটি বা দুটি বাক্যে সংজ্ঞা দেওয়া অপেক্ষাও পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেজন্য Tbilisi Conference এর সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী অংশগুলিতে উল্লেখ করা হবে। আপাতত এখানে দেখা দরকার পরিবেশ শিক্ষার উপরোক্ত দুটি সংজ্ঞা থেকে কোন্ কোন্ প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করার উপযোগী।

পরিবেশ শিক্ষা বিশেষ কতগুলি মূল্যবোধকে চিহ্নিত করে সেগুলি আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

- পরিবেশ কথাটির অর্থ একটি জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে তাদের জৈবিক পরিমণ্ডলের সম্পর্ক, ভৌত পরিমণ্ডল, মানুষ ও জৈব পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানুষের কৃষ্টির সঙ্গে এই সবকয়টির সম্পর্ক, এই সব মিলে যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জ্ঞান তৈরি করেছে, প্রত্যেক মানুষেরই তা জানা ও বোঝা দরকার। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকেই এই সম্পর্ক জানতে ও বুঝতে পারে।

- পরিবেশের উপাদানগুলির সম্পর্ক জানা, বোঝা ও আত্মস্থ করার জন্য প্রয়োজন পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস ও বিশেষ ধরনের দক্ষতা। পরিবেশ শিক্ষাই ঐ সব দক্ষতা ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস বিকাশের প্রকৃত বাহন।

- পরিবেশের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও তাৎপর্য এক পরম উপভোগের বিষয়। ভোগের জন্য পরিবেশ ধ্বংস না করে, পরিবেশকে অবিকৃত রেখে তার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার শিক্ষাও পরিবেশ শিক্ষা থেকেই লাভ করা সম্ভব।

- পরিবেশের গুণমান বজায় রাখার জন্য দরকার বিশেষ পরিবেশবান্ধব আচরণবিধি। এই ধরনের আচরণবিধি নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। নিজস্ব জ্ঞান, প্রতিন্যাস, বিচারবোধ, এবং পরিবেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের থেকে আচরণ বিধি তৈরি করে নিতে হয়। পরিবেশ শিক্ষার ফলে ব্যক্তি নিজের আচরণবিধি নিজেই তৈরি করে নিতে পারে।

- সবশেষে আচরণবিধি স্থির করাই যথেষ্ট নয়। কারণ পরিবেশবান্ধব আচরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংযম, স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা। সুতরাং যত বাধাই আসুক না কেন নিজের আচরণবিধি পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তিও পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যায়। এখানেই পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম সার্থকতা।

6.3.2 পরিবেশ শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief History of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার উৎস সন্ধান করতে হলে ফিরে যেতে হয় অতি প্রাচীন কালে। প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি। সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এর ফলে মানুষের মনে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা তৈরি হত, প্রকৃতির সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হত। বৈদিক সভ্যতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ আরও নিবিড় হয়ে উঠল। অসংখ্য বৈদিক প্রার্থনামন্ত্রে প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির জন্য মানুষের গভীর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশ, বাতাস, উদ্ভিদ, প্রাণি সবকিছুই যাতে মধুময় সুন্দর হয়ে ওঠে তার জন্য দেবতাদের কাছে বার বার প্রার্থনা করেছেন তারা।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রার্থনাই নয়, সেই সময়ে ভোগ্যবস্তুর তুলনায় ভোগী মানুষের সংখ্যা ছিল নগন্য। কিন্তু অপরিমিত ভোগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে নানা বাধা নিষেধ, ব্রত পালনের নিয়ম কানুন, উৎসব আচার অনুষ্ঠান, উপবাস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় বিধিনিষেধের শক্তি সবচেয়ে বেশি বলেই তা জীবনযাপন ও ধর্মাচরণের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মাচরণ ক্রমশ আচার

সর্বস্ব হয়ে উঠল। ফলে প্রকৃতি সংরক্ষণ করার তাৎপর্য অন্ধ বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের তলায় চাপা পড়ে গেল। একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।

ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উদ্ভিদ ও তার ভেষজগুণ সম্বন্ধে বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা যায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও ভেষজ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে সেকালের মানুষ বিশেষ ভাবে সচেতন ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে আয়ুর্বেদের ব্যাপক অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে মূল্যবোধেরও ক্রমশ হানি ঘটতে থাকল। সুতরাং যদি প্রাচীন কালকে পরিবেশ শিক্ষার আদি পর্ব হিসাবে মানা যায়, তবে বলতে হয় সেই পরিবেশ শিক্ষা ছিল পরোক্ষ, প্রথা বহির্ভূত (Non-formal) এবং আচার নির্ভর।

আধুনিক ধারায় পরিবেশ শিক্ষার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। 1899 সালে স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক Patrick Geddes, The Outlook Tower নামে একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি মনে করতেন পরিবেশ ও শিক্ষা পরস্পর নির্ভরশীল সুতরাং শিক্ষা ও পরিবেশের উন্নয়ন একযোগে করতে হবে— একটির উন্নতি হলে অপরটিরও উন্নতি হবে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা দার্শনিকরা প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন। রুশো শিশুর শিক্ষায় প্রাকৃতিক উপাদানকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী প্রমুখ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার সাযুজ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কেউই প্রকৃতির জন্য, প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতির সাহায্যে শিক্ষা—এইভাবে বিষয়টিকে দেখেননি।

George Perkin Marsh একটি বই (Man and Nature or Physical Geography) লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নয়। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে সভ্যতা বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না।

1908 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট Theodore Roosvelt হোয়াইট হাউসে প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের সভা ডাকেন। ঐ সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পরিবেশ সংরক্ষণ। কিন্তু তার জন্য পরবর্তীকালে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিনা তা খুব স্পষ্ট নয়। পরিবেশ শিক্ষা কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় Keele বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পরিবেশ শিক্ষাকে শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। এর ফলে সর্বপ্রথম সকলে উপলব্ধি করেন জীববিদ্যা আর জীবজগতের ভারসাম্য সম্বন্ধে শিক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। পরিবেশ শিক্ষা সে তুলনায় অনেক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী।

বিচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের আরও কিছু কিছু উদ্যোগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নেওয়া হলেও প্রকৃত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়া হয় 1972 সালে। স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় মানব পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে (International Conference on Human Environment) পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত জন্মভূমি বলা যায়। এই সম্মেলনে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ কার্যক্রম (United Nations Environment Programme) গৃহীত হয় এবং UNESCO'র সঙ্গে যৌথভাবে 1975 সালে আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমের (Inernational Environment Education Programme) সূচনা হয়।

IEEP'র উদ্যোগে, 1975 সালে বেলগ্রেডে আন্তর্জাতিক পরিবেশশিক্ষার কর্মশালা (International Workshop on Environmental Education) অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার প্রস্তুতি হিসাবে এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা যায় অধিকাংশ দেশই পরিবেশ শিক্ষার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে এবং চারটি স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে। এই চারটি স্তর,

- প্রাথমিক শিক্ষা।
- মাধ্যমিক শিক্ষা।
- আঞ্চলিক স্তরের শিক্ষা।
- বিদ্যালয় বাইর্ভূত শিক্ষা।

সেই সঙ্গে অধিকাংশ দেশই প্রথাগত এবং প্রথা বহির্ভূত এই দুই প্রকার শিক্ষার সঙ্গেই পরিবেশ শিক্ষাকে যুক্ত করার স্বপক্ষে মত দিয়েছে। বেলগ্রেড কর্মশালা থেকে চারখণ্ডে বিভক্ত বেলগ্রেড সনদ (Belgrade Charter) রচিত হয়। এই চারটি খণ্ডের বিষয়বস্তু,

- পরিবেশের পরিস্থিতি (Environmental situation)
- পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য (Environmental Goal)
- পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য (Environmental Education Goal)
- পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য (Environmental Education Objectives)

বেলগ্রেড কর্মশালার পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। 1976 সালের এপ্রিল মাস থেকে 1977 সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ, ইউরোপ, উত্তর ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে এবং এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে 1976 সালের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ককে এশিয় সম্মেলন হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল,

- বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ শিক্ষার কার্যক্রমগুলি আলোচনা করা।
- বেলগ্রেড কর্মশালার সুপারিশ ও নির্দেশগুলির পুনরালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন।
- আঞ্চলিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।

ব্যাঙ্ককের এশিয় সম্মেলনে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পায় তার মধ্যে আছে,

- পরিবেশ শিক্ষার কার্যপ্রণালী।
- প্রশিক্ষণ।
- প্রথাবহির্ভূত পরিবেশ শিক্ষা।
- পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ তৈরি করা।

আঞ্চলিক সম্মেলনের পর 1977 সালে জর্জিয়ায় Tbilisi সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং তার পর আবার আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1980 সালে ব্যাঙ্ককে। এই সম্মেলনে, পরিবেশ শিক্ষার প্রায় সমস্ত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং পরস্পর অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটে। যেমন, পাঠক্রম তৈরি করা, শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষণের কার্যক্রম সংগঠিত করা, বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে পরিবেশ শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর করা ইত্যাদি। এই সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শাখা সংগঠনগুলির বিশেষজ্ঞরা, যথা, UNESCO, WHO, WMO, ILO, FAO ইত্যাদি নানাভাবে সাহায্য করে।

এই সব কার্যক্রমের ফলে পরবর্তী সময়ে এক একটি দেশ তার নিজের মত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ হল,

- পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন। যেমন, চীন, ভারত, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা দূষণ নিরোধক আইন প্রণয়ন করে। কোরিয়া পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে।

- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র সংগঠন স্থাপন করা। যেমন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (Pollution Control Board) আদালতের গ্রিন বেঞ্চ ইত্যাদি।
- পরিবেশ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া। যেমন, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিটি স্তরে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষার প্রায় প্রতিটি স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমেও পরিবেশ শিক্ষা অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিজ্ঞান চর্চা, পঠন পাঠন ও গবেষণা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও পরিবেশ বিজ্ঞান ও পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র তবুও উপরোক্ত চর্চা ও গবেষণা পরিবেশ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পদ্ধতিকে সমৃদ্ধি করে চলেছে।

6.4 পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি বিচার করার আগে জানা দরকার পরিবেশ বলতে কি বোঝায়? পরিবেশ ও ইকোলজি এই দুটি শব্দ অনেকের কাছে সমার্থক বলে মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই শব্দ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত হলেও কিছুটা ভিন্নার্থক। পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

সমস্ত রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, ভৌতিক অথবা রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয় যা মানুষের চারপাশের পরিমণ্ডল রচনা করে তাই হল পরিবেশ। (Environment is the sum of all social, economical, biological, physical or chemical factors which constitute the surroundings of man)।

অপেক্ষাকৃত সরলতর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

পরিবেশ অর্থে বোঝায় কোন একটি দেশ এবং কালে যে সব পরিস্থিতি মানুষকে ঘিরে রাখে তার সমষ্টি (Environment refers to the sum total of conditions which surround man at a given point in space and time)।

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় দেশ এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের সংজ্ঞা দেওয়ার তাৎপর্য এই যে এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে, পরিবেশ পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল একটি ধারণা। কিন্তু মানুষের চারপাশের সামাজিক, ভৌত এবং জৈবিক উপাদানগুলির সমষ্টি যে পরিবেশের ভিত্তি এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তবে উভয় সংজ্ঞাতেই পরিবেশের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, মানুষের সঙ্গে তাদের, সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি উহ্য থেকেছে। এমন ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যেন পরিবেশ একটি নিষ্ক্রিয় পরিমণ্ডল মাত্র।

ইকো (Eco) কথাটির অর্থ গৃহ। সুতরাং ইকোতন্ত্র (Ecosystem) কথাটির অর্থ দাঁড়ায় জীবকুলের আবাস বা ধারক এবং তাদের সম্মিলিত একটি সংগঠন। আর ইকোলজি (Ecology) অর্থ মানুষ ও অন্যান্য জীবকুলের আবাস যে প্রকৃতি, তার বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চর্চা (Study of the interrelation, interdependence and interaction of the factor of nature which forms the abode of man and other living organisms)। মানুষ জীবিত প্রাণিকুল এবং প্রকৃতির অংশ। সেই অর্থে সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরতার বিষয়টিই ইকোলজির চর্চার বিষয়।

উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখলে পরিবৈশ শিক্ষার প্রকৃতি অনুধাবন করা সহজ হবে।

জীবন ব্যাপী শিক্ষা (Life long education) : যেহেতু পরিবেশ কোন স্থিতিশীল বস্তু নয়, দেশ ও কালভেদে তার পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু পরিবেশ শিক্ষাও জীবন ব্যাপী একটি প্রক্রিয়া। বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার সূত্রপাত হলেও পরবর্তী জীবনেও তার ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। না হলে পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আচরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন।

পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্য (Study material of Environmental Education) : পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্য, পরিবেশ নিজেই। ইকোলজির সংজ্ঞায় যে কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে তার তাৎপর্য অনুযায়ী পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের চারপাশের জৈবিক ও ভৌত উপাদানগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে অবস্থিত হবে। সুতরাং পরিবেশকে জানা বোঝা পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বয় (Environmental Education is multidisciplinary) : পরিবেশ বিজ্ঞান যেমন কোন স্বতন্ত্র মৌলিক বিদ্যা নয়, তেমনি পরিবেশ শিক্ষাও কোন আলাদা বিষয় নয়। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, ইত্যাদি বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যেই পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র এই সব বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিবেশলব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে পরিবেশ শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা দরকার। সেইজন্য পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বয়।

পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতি ও ক্ষেত্র, পরিবেশ (Method and field of Environmental Education is environment itself) : সম্ভবত আর কোন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও ক্ষেত্র একই। পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে পরিবেশ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পরিবেশের বুকে পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় আদান প্রদানের মাধ্যমেই পরিবেশ শিক্ষা সার্থক হতে পারে। সেই কারণেই বলা হয়েছে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্র ও পদ্ধতি পরিবেশ নিজেই।

পরিবেশ শিক্ষা অংশগ্রহণমূলক (Environmental Education is Participatory) : পরিবেশ থেকে দূরে থেকে যেমন পরিবেশ শিক্ষা হয় না তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থান থেকেও পরিবেশ শিক্ষা হয় না। প্রথম দিকে অনেকেই ভেবেছিলেন পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা (Awareness), পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস (Positive attitude) এবং মূল্যবোধ তৈরি হলে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব আচরণ আয়ত্ত করা সহজ হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে একমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে এবং পরিবেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে তার মধ্যে দিয়েই পরিবেশ সচেতনতা তৈরি হওয়া সম্ভব। সক্রিয়তাই প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। সুতরাং শুধু মাত্র বই পড়ে বা তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে পরিবেশ শিক্ষা হয় না, সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

পরিবেশ শিক্ষা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত (Environmental Education is related to the Other Controlling forces) : যেহেতু পরিবেশের উপাদান হিসাবে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শক্তিগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনও না কোনও ভূমিকা নিয়ে থাকে সেহেতু পরিবেশ শিক্ষা ঐ সব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, কোন দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভূমিকা কি তা বোঝা দরকার। যদি বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয় এবং সামাজিকভাবে অরণ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবেগ ও সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা থাকে (যেমন, আদিবাসীদের ক্ষেত্রে) তবে ঐ সব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির কথা অগ্রাহ্য করে নীতি নির্ধারণ করলে তা

কার্যকর করা কঠিন। এই ধরনের আরও উদাহরণ দিলে দেখা যাবে। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে ঐসব জটিল নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলি সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার।

6.5 পরিবেশ শিক্ষার পরিধি (Scope of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক, এই নিয়েই পরিবেশ শিক্ষার পরিধি সংক্রান্ত আলোচনা করা দরকার। ইতিমধ্যেই পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হল।

6.5.1 পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject matter of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার এক একটি স্তরে ভিন্ন রকম।

প্রাথমিক স্তর (Elementary level) : প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই পরিবেশ শিক্ষার সূচনা হতে পারে কিন্তু পরিবেশ শিক্ষা নামক স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে নয়। এই স্তরে, শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবে। চারপাশের গাছপালা, পশুপাখি, ফুলফল, জল, বাতাস, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি যা কিছু প্রত্যক্ষগোচর সে সম্বন্ধে তারা পরিচিত হবে শিক্ষক ও পিতামাতার সহযোগিতায়। কিভাবে কীট পতঙ্গ উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। কিভাবে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে সাধারণ প্রাণীরা পরস্পর আবদ্ধ, মানুষের জীবনে তাদের গুরুত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে কোন তাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়াই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে শিশুরা। এই ধরনের প্রকৃতি পরিচিতি তাদের পরবর্তী পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করবে। সেই সঙ্গে পরিবেশের প্রতি অনুরাগ ও একাত্মতা বোধ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও প্রাথমিক স্তরে শিশুদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশবান্ধব আচরণ ও অভ্যাস আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছের লালন পালনের দায়িত্বও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের দেওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমেও পরিবেশ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ ও পরবর্তীকালে মূল্যবোধ তৈরির ভিত্তি প্রস্তুত হবে।

- **মাধ্যমিক স্তর (Secondary level) :** মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি পরিবেশ শিক্ষার সূত্রপাত করা হয়।

—পরিবেশের উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন (Acquiring Knowdege about the components of environment) : পরিবেশ একটি সামগ্রিক ধারণা হলেও তার যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আছে সে সম্বন্ধে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পরিবেশের ভৌত, সামাজিক ও জৈব উপাদানগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা বিষয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির পাঠ্যসূচিতে পরিবেশের উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান ছড়িয়ে আছে। সেগুলি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা দরকার এবং যে সবক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা আছে সে ক্ষেত্রে তা পূর্ণ করা দরকার।

—উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter / relation of the Components) : পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের পূর্ণাঙ্গ রূপটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা তৈরি হয়। সেজন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয় তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু এই কাজ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বক্তৃতার মাধ্যমে সফল করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একমুখী বিষয় ভিত্তিক তথ্যের

উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

—পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার চিহ্নিত করণ (Identification of the Environmental Problems) : মানুষের কাছে অনেক সময়ই পরিবেশের বিপদগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। নিজের অজ্ঞাতেই তারা দূষণ ছড়ায়, পরিবেশ নষ্ট করে। তাৎক্ষণিক আনন্দের জন্য সুদূর প্রসারী ক্ষতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যায়, অপচয় করে কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম কাজ পরিবেশের বিপদগুলি সম্বন্ধে কিশোর কিশোরীদের সচেতন করে তোলা। যে সব সমস্যা এখনই ক্ষতি করছে, যে সব সমস্যা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ক্ষতি করবে সে সব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

—সমস্যাগুলির কারণ অনুধাবন করা (Understanding the causes of these Problems) : শুধু মাত্র সমস্যাগুলি চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম বিষয় ঐসব সমস্যার প্রাথমিক কারণগুলিকে তুলে ধরা। ধর্মীয় কারণে জলাশয় দূষণ, ভূগর্ভস্থ ও ভূস্তরের জল সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহারের কারণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, প্রাণি ও উদ্ভিদ ধ্বংস করার কারণগুলি সহজবোধ্য ভাবে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

—প্রতিকারের দক্ষতা অর্জন (Acquisition of Remedial Skills) : সমস্যা ও সমস্যার কারণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষা তার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীরা দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে পারে না ঠিকই কিন্তু দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় পরিবেশবান্ধব আচরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে বহু সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারে। সেজন্য যে সমস্ত আচরণগত দক্ষতা (Behavioural Skill), সামাজিক দক্ষতা (Social Skill), প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা (Cognitive Skill) ইত্যাদি দরকার—পরিবেশ শিক্ষা সেইসব দক্ষতা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

—আনুষঙ্গিক মূল্যবোধের শিক্ষা (Associated value education) : পরিবেশ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী জীবনে শৃংখলা ও সংযম আয়ত্ত করার শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষের মূল্যবোধ ও ইতিবাচক প্রতিন্যাসের ভিত্তি। পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ সংরক্ষণের দক্ষতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া সবকিছুর সঙ্গেই যুক্ত শৃংখলাবোধ ও সংযম। প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে এই গুণগুলি আয়ত্ত হলে, গোষ্ঠী জীবনে তার প্রভাব পড়ে। যেমন, জনসংখ্যার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বুঝলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজনগুলিও স্পষ্ট হয়ে যায়, ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব পড়ে। এই দিক থেকে পরিবেশ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

—উচ্চতর শিক্ষা (Higher Education) : উচ্চতর শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা নির্বাচনধর্মী এবং বিশেষজ্ঞতামুখী (Selective and specialization oriented)। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্ষমতা, পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী কিছু কিছু নির্বাচিত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করার জন্য শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার যে ভিত্তি তৈরি হয় তাকে আরও দৃঢ় ও নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ শিক্ষা ক্রমশ পরিবেশ বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠে। পরিবেশ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞান লাভের জন্য কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষাকে সংযুক্ত করা দরকার। পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবেশকে বিচার করতে শিখবে, সমাজ বিদ্যার শাখাগুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা আলাদা হতে পারে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য উভয়ের জন্য একই।

বিশ্ববিদ্যালয় এরে পরিবেশ শিক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা

(Environment and Environment related Research)। গবেষণা নতুন জ্ঞানের জন্ম দেয়। নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে আর সেই সঙ্গে ক্রমাগত শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে চলে। এই কাজগুলিই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রধান বিষয়।

- **সর্বস্তরের সাধারণ বিষয় (Common subjects in all stages) :** পরিবেশ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে শিক্ষকরা কাজ করে থাকেন। এই বিষয়গুলি পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে তার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট।

- পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম।
- পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ।
- পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি।
- পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী।
- পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়ন।

6.5.2 পরিবেশ শিক্ষা ও অন্যান্য বিজ্ঞান (Environmental Education and Other Sciences) :

পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বয়। এখানে কয়েকটি বিষয়ের কথা তুলে ধরা হল। তার আগে স্মরণ করা দরকার পরিবেশ শিক্ষার Tbilisi সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শাখা সংগঠনগুলির (United Nations Education, Social and Cultural Organization, World Health Organization ; World Meteriological Organization ; International Labour Organization ; Food and Agricultural Organization, ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কারণ তখন থেকেই পরিবেশ শিক্ষার বহুমুখিতা স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল।

- **পদার্থবিদ্যা (Physics)** : পদার্থবিদ্যা আমাদের ভৌত পরিমণ্ডল, শক্তি (Energy), তাদের উৎস ও ধর্ম, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পদার্থের স্বরূপ ও গঠন ইত্যাদি বিষয়ের বিজ্ঞান। সুতরাং পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত পদার্থবিদ্যার কাছে ঋণী। শক্তির রূপান্তরের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কটি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- **রসায়ন (Chemistry) :** আমাদের চারপাশের জগতে পদার্থের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে মৌলবস্তু ও যৌগগুলির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে পরিবেশের চরিত্র নির্ধারণে তার ভূমিকা অনিবার্য। রসায়নের তিনটি প্রধান শাখা— অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry), জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) ও ভৌত রসায়ন (Physical Chemistry) সমানভাবে পরিবেশ বিষয়ে কার্যকারণ ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে। সেজন্য রসায়ন পরিবেশ বিদ্যা ও শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি।

- **গণিত (Mathematics) :** গণিত হল সমস্ত বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক ভিত্তি। পরিবেশ শিক্ষায় গণিত প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও, পরিবেশ সংক্রান্ত গাণিতিক মডেল (Mathematical Model) পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চিন্তাকে পরিশীলিত করে।

- **প্রাণি ও উদ্ভিদ বিদ্যা (Zoology & Botany)** : প্রাণি ও উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইকোলজির আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা প্রধান দুটি ইকোতন্ত্রের কথা বলেন— জৈবিক (Biotic) এবং অজৈবিক (Abiotic)। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে জীবজগতের ভারসাম্যই পরিবেশ শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়।

● **শারীর বিদ্যা (Physiology) :** প্রাণি বিদ্যারই বিশেষ শাখা হলেও মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের গঠন ও কাজ, দেহরসগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ও বিপুল জ্ঞানের উৎস শারীর বিদ্যা। পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শরীরের ও মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের পরিবর্তন, দূষণ, ইত্যাদি সবচেয়ে, বেশি প্রভাবিত করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, কোষকলাতন্ত্র ইত্যাদি সবকিছুকে। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষা শারীর বিদ্যার জ্ঞান ছাড়া হতে পারে না।

● **মনোবিজ্ঞান (Psychology) :** মনোবিজ্ঞান মানুষের সমস্ত রকম আচরণের প্রকৃতি ও কারণ নিয়ে গবেষণা করে। আমাদের সংবেদন-প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, মনোযোগ, চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের চর্চার বিষয়। পরিবেশের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের দ্বিমুখী সম্পর্ক। একদিকে পরিবেশ ক্রমাগত আমাদের আচরণের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে আমাদের অবাঞ্ছিত আচরণের ফলেই পরিবেশের ক্ষতি হয়। সেজন্য পরিবেশ সংরক্ষণ, মূল্যবোধ গঠন, সহায়ক আচরণ আয়ত্ত করা সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিবেশ শিক্ষাকে নির্ভর করতে হয় মনোবিজ্ঞানের উপর।

● **শিক্ষা (Education) :** শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে দীর্ঘকাল ধরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকরণ, পদ্ধতি, প্রযুক্তি, পাঠক্রম, পরিমাপ ও মূল্যায়ন সবকিছুর ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও শিক্ষার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান। পরিবেশ শিক্ষা, শিক্ষাবিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেদিক থেকে পরিবেশ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কিত।

● **অন্যান্য বিদ্যা (Other disciplines) :** পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তালিকা দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে কিন্তু শেষ করা কঠিন। পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) প্রকৃত পক্ষে একটি বহুবচন বাচক শব্দ। আবহাওয়া বিজ্ঞান (Meteriology), সমাজবিদ্যা (Sociology), ইতিহাস (History), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), অর্থশাস্ত্র (Economics) প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই পরিবেশ শিক্ষার কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে। জনবিজ্ঞান (Demography), জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education) ও রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক আরও নিবিড়। কারণ পরিবেশ ও জনসংখ্যার প্রকৃতি, বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উপর পরিবেশের গুণগত মান বিশেষভাবে নির্ভরশীল। রাশিবিজ্ঞান পরিবেশ বিষয়ক পরিমাণগত তথ্যের (Quantitative data) বিন্যাস ও বিশ্লেষণ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য। আর এই সব সিদ্ধান্তের অনেকটাই পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

6.5.3 পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Environmental Education) :

পরিবেশ শিক্ষা সর্বস্তরে একান্ত আবশ্যিক হলেও এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে।

● পরিবেশ শিক্ষা সরাসরি পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষণা করে না। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম, পদ্ধতি ও প্রকরণ বিষয়ে গবেষণা ও পরিবেশ শিক্ষার ফলাফল এই বিদ্যার চর্চার বিষয়। এই কারণে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাছে কখনও কখনও কিছুটা অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে।

● পরিবেশ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বিকল্প নয়, কিছুটা পরিপূরক। অর্থাৎ পরিবেশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলি শিক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরলেও, মৌলিক বিদ্যা চর্চায় যেন বাধা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। যেমন, সালোকসংশ্লেষের (Photosynthesis) মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইডের বিশ্লেষণ ও অক্সিজেনের বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণের একটি বিশেষ দিক। কিন্তু সেজন্য সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মূল প্রসঙ্গটিকে অবহেলা করলে চলবে না।

● পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনে ও গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে

পরিবার ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি ও পরিস্থিতির প্রভাব সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অনেক সময় ঐ সব প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা অকেজো হয়ে যায়।

- পরিবেশ শিক্ষায় বহুব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করাতে পারলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু সীমিত সময়, শক্তি ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতার দরুণ তা সম্ভব হয় না। ধীরে ধীরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়ে এবং গতানুগতিক শিক্ষায় পরিণত হয়।
- শিক্ষকদের উদ্যম, উৎসাহ এবং প্রশিক্ষণের উপর পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু সমস্ত শিক্ষক সমান উৎসাহী বা উদ্যমী নন। ফলে পরিবেশ শিক্ষা অনেক সময়ই নিয়ম রক্ষায় পর্যবসিত হয়।
- অতিরিক্ত পরীক্ষা নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরি করার চেয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা পরীক্ষায় তার গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্য আরোপ করে থাকেন। তখন পরিবেশ শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।
- পরিবেশ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়ের সার্থকতা বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

এক কথায় পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ তখনই সফল হতে পারে যখন সকলের সক্রিয় সমর্থন, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে উদাসীন থাকলে পরিবেশ শিক্ষা কাগজে কলমে অর্জিত বিদ্যা হয়ে থাকবে, কখনই তার ফলাফল পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

6.6 পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Environmental Education)

পূর্ববর্তী আলোচ্য অংশগুলিতে পরিবেশ শিক্ষার অনেকগুলি উদ্দেশ্য নানা ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ ভাবে উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টভাবে একত্রে উল্লেখ না করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেগুলি সম্বন্ধে ধারণালাভ করা কঠিন। যদিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের মধ্যে সঠিক সীমারেখা টানা যায় না তবুও আলোচনার সুবিধার্থে এই দুই ভাগে ভাগ করে উদ্দেশ্যগুলি নিচে দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে এই সব উদ্দেশ্যগুলি নানাভাবে Tbilisi ও ব্যাঙ্কক সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে।

6.6.1 প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য (Direct Objectives)

সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিও তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত। প্রজ্ঞামূলক (Cognitive), অনুভবমূলক (Affective) এবং সঞ্চালনমূলক (Psychomotor), এই তিন প্রকার উদ্দেশ্যকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করে এখানে উদ্দেশ্যগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল।

- চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge) লাভ করার জন্য পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজন।
- চারপাশের মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ ও ভৌত পরিবেশের বাইরে যে বৃহত্তর পরিমণ্ডল আছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।
- পরিবেশ সংক্রান্ত পদ (Term), সংজ্ঞা, গতিপ্রকৃতি (Trend), সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।
- জৈব ও অজৈব (Biotic and Abiotic) প্রকৃতির সম্পর্ক অনুধাবন করা।
- সম্পদ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা।
- সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার তথা অপচয়ের তাৎপর্য বোধ হওয়া এবং অবশ্যই অপব্যবহারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা।

- সম্পদের সুষম বণ্টন ও সদ্ব্যবহারের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, সংশ্লিষ্ট আচরণগুলি চিহ্নিত করা।
- উপরোক্ত ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে পার্থক্য করার দক্ষতা অর্জন।
- দূষণের কারণ ও প্রভাবগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য পদ্ধতিগুলি জানা।
- পরিবেশ সম্বন্ধীয় তথ্য আহরণ করা, তাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা।
- বিভিন্ন পরিস্থিতি, ঘটনা, সিদ্ধান্ত, আচরণ ইত্যাদির পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন করা।
- পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও তার মধ্যেকার খুঁটিনাটি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন। পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পরিবেশ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।
- পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয়গুলির তৎপরতা বৃদ্ধির চেষ্টা। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ত্বক সংবেদন, ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণের তৎপরতা পরিবেশের মধ্যেকার ছোটখাট পরিবর্তনগুলিও জানতে বুঝতে সাহায্য করে। অনেক সময় বৃহত্তর পরিবেশ অবনমনের সূচনা ছোটখাট পরিবর্তনের মাধ্যমেই বোঝা যায়।
- পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য নানাভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন করা। যেমন, লিখন, চিত্রাঙ্কন, গ্রাফ ও ম্যাপ তৈরি, সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার, ইত্যাদি।
- প্রাণি ও উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে স্থায়ী আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া।
- প্রকৃতি ও পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক রূপ উপলব্ধি করা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা।
- ভালোমন্দ নির্বিচারে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সমস্ত স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে নিজের আচরণকে পরিবর্তন করার মনোভাব।
- সঠিক মূল্যবোধ ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস গঠন।
- বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নানা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উৎসাহ।
- দূষণ নিরোধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহ।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জনমত গঠন, পরিবেশ নষ্টকারী আচরণ প্রতিরোধের সাহস, দক্ষতা ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রকৃত অংশগ্রহণ।
- পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে সঠিক মতামত প্রদানের দক্ষতা।
- বিকল্প শক্তির ব্যবহার, পরিবর্তন সহ্য করার (Tolerance) ক্ষমতা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, এবং প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগ করার মানসিকতার বিকাশ।

অন্যদিকে UNESCO পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছে।

- **সচেতনতা** (Awareness) : ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে, সচেতন ও সংবেদনশীল হয়ে ওঠার শিক্ষা।
- **জ্ঞান** (Knowledge) : সামগ্রিকভাবে পরিবেশকে জানা ও বোঝার জন্য শিক্ষা।
- **প্রতিন্যাস** (Attitude) : ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির পরিবেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণের পক্ষে ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার প্রেষণা, ইতিবাচক প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ বিকাশের শিক্ষা।
- **দক্ষতা** (Skill) : পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা।

- **মূল্যায়নের ক্ষমতা** (Evaluation ability) : পরিবেশ, পরিবেশের ভারসাম্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা এবং প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন করার শিক্ষা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নান্দনিক ও নৈতিক কোন প্রসঙ্গই মূল্যায়ন ও বিচারের বাইরে থাকবে না।

- **অংশগ্রহণ** (Participation) : ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলগতভাবে পরিবেশ সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ করা, অন্যকে অংশগ্রহণে প্ররোচিত করা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করার শিক্ষা।

এই ছয় প্রকার উদ্দেশ্যই পূর্ববর্তী অশ্রেণিবিভক্ত তালিকায় বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য একক ও দলগত ভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগের বিকাশ ঘটানো।

6.6.2 পরোক্ষ উদ্দেশ্য (Indirect Objectives)

- একথা প্রথমেই বলা হয়েছে যে পরিবেশ শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। তবুও নিচে কয়েকটি পরোক্ষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হল।

- পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ন্যায়নীতি (Ethical) ও সুবিচার বোধের বিকাশ ঘটে। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ হিসাবে মহত্তর মানবিক গুণগুলি মানুষের আচরণের প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে।

- সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ ঘটে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে।

- মানুষের সহনশীলতার বিকাশ পরিবেশ শিক্ষার জ্ঞান ও অংশগ্রহণ জনিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো হয়।

- পরিচ্ছন্নতা বোধ, সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কারণ পরিবেশ ধ্বংস ও অপচয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা ও অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের সম্পর্ক নিবিড়।

- নেতৃত্ব গুণ, দলগত অংশগ্রহণ, যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ, সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রতি নিরাসক্ত মনোভাব পরিবেশ শিক্ষার ও সক্রিয়তার ফসল।

- আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম, অবসরকালীন জীবনের সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তি তৈরি করে পরিবেশ শিক্ষা।

6.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞায় মানুষ, তার জৈবিক ও ভৌত পরিমণ্ডল, কৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যেকার জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও গুণগুলি আয়ত্ত করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে পরিবেশ শিক্ষার ফলে মানুষ পরিবেশ সহায়ক আচরণগুলি নিজের জন্য স্থির করে নিতে পারবে এবং ঐ আচরণগুলি পালন করার স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করবে। পরিবেশ শিক্ষা কোন সাময়িক শিক্ষা নয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশে সারা জীবন ধরেই পরিবেশ শিক্ষা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। পরিবেশ শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস তৈরির সহায়ক।

প্রাচীন কালের মানুষও যথেষ্ট পরিবেশ সচেতন ছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, আচার, রীতি নীতির মধ্যে

পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মানুষের পরিবেশ চেতনা আচার অনুষ্ঠানের তলায় চাঁপা পড়ে যায় এবং পরিবেশের সঙ্গে মানুষের তখন থেকেই বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে আধুনিক পরিবেশ শিক্ষার সূচনা। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও প্রকৃত আন্তর্জাতিক তৎপরতা শুরু হয় 1970 সালের পরবর্তী সময়ে। UNESCO'র উদ্যোগে 1972 সালে স্টকহোমে International Conference on Human Environment অনুষ্ঠিত হয়। তারপর 1975 সালে বেলগ্রেডে, তারপর ব্যাঙ্ককে একের পর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সম্মেলন ও কর্মশালা থেকে পরিবেশ বিদ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা ক্রমশ আলোচনা ও চর্চার শীর্ষে উঠে আসে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ শিক্ষার প্রচলন হয়।

পরিবেশ কথাটির অর্থ কোন বিশেষ সময়ে এবং স্থানে মানুষের চারপাশের জৈব, সামাজিক ও ভৌত উপাদানগুলি দ্বারা সৃষ্ট পরিমণ্ডল। আর ইকোলজি কথাটির অর্থ ঐসব উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরতা। পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি নির্ভর করে উপরোক্ত দুটির ওপর।

পরিবেশ শিক্ষা একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া যা প্রকৃত পক্ষে বহুবিদ্যার সমন্বয়। পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্যবিষয়, চর্চার ক্ষেত্র এবং শিক্ষক পরিবেশ নিজেই। পরিবেশ শিক্ষা সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত লাভ করা যায় না এবং অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অনেক নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশ শিক্ষার পরিধি হিসাবে এর বিষয় বস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা। প্রাথমিক স্তরে শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং পরিবেশ সহায়ক সু অভ্যাস অর্জন করবে। মাধ্যমিক স্তরে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের সাহায্যে পরিবেশের উপাদান, পারস্পরিক সম্পর্ক, দূষণ প্রভৃতি পরিবেশের সমস্যাগুলি ও তার প্রতিকার এই সব প্রসঙ্গে জ্ঞান লাভ করবে। প্রয়োজনীয় আচরণ বিধি ও দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করবে এবং ভবিষ্যৎ মূল্যবোধ গঠনের জন্য প্রস্তুত হবে। উচ্চতর শিক্ষায় পরিবেশ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবেশ শিক্ষা পরিচালিত হবে। গবেষণার সাহায্যে নতুন জ্ঞান লাভ করা বিচার বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করার শিক্ষাও উচ্চতর পর্যায়ে দিতে হবে। সব কয়টি স্তরের জন্য, পাঠক্রম রচনা করা, উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করা, পদ্ধতি নির্ণয়, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম স্থির করা এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ণয় করাও পরিবেশ শিক্ষার কাজ।

পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বিত চর্চা। সেজন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা। শারীরবিদ্যা, গণিত, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, শিক্ষা, রাশিবিজ্ঞান, জনবিদ্যা, জনসংখ্যা বিদ্যা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশ শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলেও নানা কারণে এর কতগুলি সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। পরিবেশ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বিকল্প নয়। এর সার্থকতা নির্ভর করে একদিকে শিক্ষকদের উৎসাহ ও উদ্যমের উপর অন্যদিকে পিতামাতা ও বাইরের অন্য মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। বাইরের প্রতিকূলতার জন্যও পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। অতিরিক্ত পরীক্ষা নির্ভরতা এবং প্রশাসনিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবেশ শিক্ষার বাধা হতে পারে। সকলের সক্রিয় উদ্যম ছাড়া পরিবেশ শিক্ষা এককভাবে সফল হওয়া কঠিন।

পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষাতেও প্রজ্ঞামূলক, অনুভবমূলক এবং সঞ্চালনমূলক এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য আছে। পরিবেশ, তার উপাদান, সমস্যা, প্রতিকার বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন এই গুলি প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য। পরিবেশ সম্বন্ধে আগ্রহ, কৌতূহল, মূল্যবোধ ও প্রতিন্যাসের বিকাশ অনুভবমূলক উদ্দেশ্য। আর পরিবেশ সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করা, তথ্য সংগ্রহ করা, পর্যবেক্ষণের দক্ষতা অর্জন করা তথ্যগুলির বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার দক্ষতা অর্জন করা এইগুলি সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য। UNESCO'র মতে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছয় প্রকার— সচেতনতা, জ্ঞান, প্রতিন্যাস, দক্ষতা, মূল্যায়নের

ক্ষমতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ। এছাড়া কয়েকটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য আছে। যেমন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার বোধের বিকাশ, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, পরিচ্ছন্নতাবোধ, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, নেতৃত্বগুণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম ও অবসরকালীন জীবন যাপনের প্রস্তুতি পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত হতে পারে।

6.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) পরিবেশের সংজ্ঞা দিন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষা কাকে বলে?

(গ) পরিবেশ শিক্ষার আন্তর্জাতিক আন্দোলন কিভাবে শুরু হয়েছিল?

(ঘ) ব্যাঙ্কক সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষাকে বহুবিদ্যার সমন্বয় বলা হয়েছে কেন?

(চ) পরিবেশ শিক্ষাকে জীবন ব্যাপী শিক্ষা বলা হয়েছে কেন?

(ছ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

(জ) প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রধানতম বিষয়বস্তু কি?

(ঝ) পরিবেশ বান্ধব আচরণ বলতে আপনি কি বোঝেন?

(ঞ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের সম্পর্ক কি?

(ট) পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতায় পিতামাতার ভূমিকা কি?

(ঠ) সম্পদের সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক কি?

(ড) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ দক্ষতার সম্পর্ক কি?

(ঢ) পরিবেশ শিক্ষা কিভাবে ন্যায়নীতি বোধের বিকাশ ঘটায়?

(ণ) পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার বিকাশ ঘটে কেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা দিন ও ব্যাখ্যা করুন।

(খ) পরিবেশ ও ইকোতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি?

(গ) প্রাচীন ভারতে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি কেমন ছিল?

(ঘ) ব্যাঙ্কক সম্মেলনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু কি?

(চ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে জীববিদ্যা ও শারীর বিদ্যার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন ও উদাহরণ দিন।

(ছ) UNESCO নির্ধারিত পরিবেশ শিক্ষার ছয় প্রকার উদ্দেশ্য কি কি?

(জ) পরিবেশ শিক্ষার কয়েকটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে আচরণ বিধির সম্পর্ক কি? উদাহরণ দিন।

৩। রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay type Questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা দিন। বিভিন্ন স্তরে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করে এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষাব সীমাবদ্ধতা কোথায়; এই সব সীমাবদ্ধতা কিভাবে দূর করা যায়? পরিবেশ শিক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষার ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করুন।

একক 7 ❑ পরিবেশের জন্য উদ্বেগ (Concern for Environment)

গঠন (Structure)

7.1 সূচনা

7.2 উদ্দেশ্য

7.3 পরিবেশের জন্য উদ্বেগ

- 7.3.1 পরিবেশ দূষণ
- 7.3.2 সম্পদের অবক্ষয়
- 7.3.3 জনসংখ্যা বৃদ্ধি

7.4 পরিবেশ ও মানুষ

- 7.4.1 ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী
- 7.4.2 মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী

7.5 সারসংক্ষেপ

7.6 প্রশ্নাবলি

7.1 সূচনা (Introduction

পরিবেশের সংজ্ঞা ও প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি, পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিচিতি ঘটেছে প্রথম এককে। পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করার পর প্রথম যে প্রশ্নটি মনে আসে তা হল পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের সঠিক বিষয়গুলি কি কি? অর্থাৎ পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সবই অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি পরিবেশের সমস্যাগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করা হয়। কারণ সমস্যাগুলির সমাধান করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে না পারলে পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। আরও সঠিকভাবে বলা যায় পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিতে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে এবং পরিবেশের উন্নয়নকল্পে যে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোথায় অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কি ধরনের কার্যক্রম স্থির করতে হবে, এসবই নির্ভর করছে উপরোক্ত উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করার উপর।

পরিবেশের একটি স্থানিক (Spatial) রূপ আছে। তার একটি পরিবর্তনশীল ও সক্রিয়তার রূপ আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় মানুষ নিজেই পরিবেশ থেকে উৎপন্ন, পরিবেশেরই একটি অংশ বিশেষ। ফলে মানুষের নিজের পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কিত।

সুতরাং মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিবেশের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা কঠিন হলেও একান্ত জরুরি। বর্তমান এককে পরিবেশের জন্য আমাদের উদ্বেগের কারণগুলি তুলে ধরাই প্রধান উদ্দেশ্য। পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত সূত্রপাত এখান থেকেই।

7.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- পরিবেশ দূষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্পদের ক্রমিক অবক্ষয় সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঐ সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

7.3 পরিবেশের জন্য উদ্বেগ (Concern for Environment)

Oxford Advanced Learner's Dictionary তে Concern শব্দটির অন্যতম অর্থ হিসাবে দেওয়া হয়েছে worry, trouble, bother ইত্যাদি। এই কথাগুলির মধ্যেই নিচের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। যে পরিবেশে আমাদের সৃষ্টি এবং বেঁচে থাকা, সেই পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের উদ্বেগ বা অশান্তি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি হয় না। আমাদেরই কৃত কর্মের জন্য উদ্বেগের সৃষ্টি। উদ্বেগের প্রথম কারণ পরিবেশ দূষণ।

7.3.1 পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution)

ল্যাটিন শব্দ Pollutionem কথাটির অর্থ নোংরা করা বা বিকৃত করা। দূষণ শব্দটির বাংলা অর্থ দোষ অর্থাৎ যা বিশুদ্ধ নয় এমন কিছু যুক্ত করা। এই দিক থেকে আক্ষরিক অর্থে পরিবেশ দূষণ বলতে বোঝায় পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব উপাদানগুলির মধ্যে এমন কিছু যুক্ত হওয়া যা ঐ উপাদানগুলির মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় (Pollution means addition of such factors to the physical, chemical and biological components of environment so that the fundamental character of those components)।

দূষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার প্রভাব সুদূর প্রসারী এবং একটি উপাদানের দূষণ অন্যগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। সেজন্য দূষণ ক্রমশ একটি জটিল অবক্ষয় শৃঙ্খলে পরিণত হয়। যে বস্তু বা শক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে পরিবেশের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে তাকেও বলা হয় দূষণ (Pollutant)। একবার চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেলে তখন ঐ উপাদানটি দূষিত (Polluted) এই বিশেষণটির সাহায্যে নির্দিষ্ট হয়, যেমন, বায়ু দূষণের ফল দূষিত বায়ু, জলদূষণের ফল দূষিত জল ইত্যাদি।

দূষণের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Pollutants) : তিনটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দূষণের শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

—দূষণের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাথমিক দূষণ (Primary Pollutant) এবং গৌণ দূষণ (Secondary Pollutant) এই দুই প্রকার দূষণের কথা বলা হয়। যে বস্তু কোন উৎস থেকে সরাসরি প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে নিসৃত হয়, তাকে বলা হয় প্রাথমিক দূষণ। যেমন, সালফার ডাই অক্সাইড কয়লা বা অনুরূপ জ্বালানি থেকে নির্গত হয়ে বাতাসে মেশে।

আবার ঐ SO_2 যখন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে সালফিউরাস এসিড (H_2SO_3) বা সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) রূপান্তরিত হয় তখন তাকে গৌণ দূষণ বলা হয়। বলা বাহুল্য SO_2 প্রাথমিক দূষণ (সমগ্র রাসায়নিক বিক্রিয়া এখানে অপ্রয়োজনীয়)।

— প্রকৃতির উপাদানগুলির মধ্যে যে অবস্থায় দূষণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় তার ভিত্তিতে পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) এই দুই প্রকার দূষণের কথা বলা হয়। যদি প্রকৃতির স্বাভাবিক কোন উপাদানের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় তখন তাকে বলা হয় পরিমাণগত দূষণ। পরিমাণগত দূষণের ফলে স্বাভাবিক উপাদানগুলির অনুপাতের পরিবর্তন হয়। যেমন, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া। মানুষের বিবেচনাহীন আচরণের জন্য যে উপাদান প্রকৃতিতে থাকার কথা নয় তার অস্তিত্ব বেড়ে যাওয়াকে গুণগত দূষণ বলে। যেমন, খাদ্য, মাটি বা জলে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি।

—সবচেয়ে বেশি প্রচলিত শ্রেণি বিভাগের ভিত্তি হল ইকোতন্ত্র (Ecosystem), এখানে জৈব পরিবর্তনশীল (Biodegradable) এবং জৈব পরিবর্তনরহিত (Non biodegradable) এই দুই প্রকার দূষণের দেখা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক নিয়মে নানা প্রকার জৈব বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিতে নিসৃত হওয়ার পর তা রাসায়নিক বিক্রিয়া শৃংখলের মাধ্যমে হয় তার মৌলিক উপাদানগুলি প্রকৃতিতে ফিরে আসে অথবা এমন সরলতর যৌগ অণুতে রূপান্তরিত হয় যা পুনরায় অন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই জাতীয় পদার্থকে জৈব পরিবর্তনশীল পদার্থ বলা হয়। স্বাভাবিক পরিমাণে ঐ জাতীয় পদার্থকে দূষণ বলা হয় না। কিন্তু যদি ঐ সব বর্জ্য পদার্থ এত বেশি পরিমাণে প্রকৃতিতে নিসৃত হয় যে তার সবটা পরিবর্তিত হতে পারে না তখন অতিরিক্ত পরিমাণের উপস্থিতি দূষণের কারণ। যেমন, বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইডের (Carbon Monoxide, CO) উপস্থিতি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে, বাতাসের অক্সিজেনের (Oxygen) সঙ্গে বিক্রিয়ায় তা প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইডে (CO_2) রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ফলে কার্বন বিশ্লিষ্ট হয়ে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় শর্করা (Carbohydrate) উৎপন্ন করে, অক্সিজেন বাতাসে ফিরে আসে। কিন্তু অত্যন্ত বেশি পরিমাণ কার্বন-মনো-অক্সাইডের উপস্থিতি, উদ্ভিদের অপ্রতুলতা এই দুইয়ে মিলে বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইডের (Carbon monoxide) পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে সাহায্য করে। তখন তা দূষণ বলে গণ্য হয়।

আবার কিছু কিছু জৈব যৌগ এমন ধরনের যা বন্ধশৃঙ্খল কার্বন অণু (Closed chain Carbon Molucule) দ্বারা তৈরি। এদের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা এতই সীমিত যে এরা বহু বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় প্রকৃতিকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, প্লাস্টিক, কীটনাশক রাসায়নিক ইত্যাদি। এদের বলা হয় জৈব পরিবর্তনরহিত পদার্থ এবং এই কারণে দূষণ হলে তা জৈব পরিবর্তনরহিত দূষণ হিসাবে পরিচিত হয়।

বায়ুদূষণ (Air Pollution) —বায়ুদূষণের প্রধান কারণ জ্বালানির ব্যবহার। সভ্যতার আদি পর্বে আগুন জ্বালাতে শিখে আগুনকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল মানুষ। সেই থেকে প্রথমে কাঠ পরে জীবাশ্মজাত জ্বালানি (Fossil fuel), যেমন, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টি হতে থাকল যে, বায়ুতে তাদের অস্তিত্ব বায়ুর স্বাভাবিক চরিত্রকে পরিবর্তিত করে নানা বিপর্যয় ডেকে আনল। এই হল বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের বায়ু দূষণের প্রকৃতি ও পরিমাণ আলাদা হলেও দূষণের কারণগুলি প্রধানত একই।

নিচের সারণিতে বায়ু দূষণের কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

দূষণের কারণ	দূষণের উৎস (জ্বালানি)	বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতি
রান্নার জন্য জ্বালানি ব্যবহার	কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি	কার্বন কণা, কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি
যানবাহন (মোটর যান, উড়ো জাহাজ, সমুদ্র যান ইত্যাদি)	পেট্রোল, ডিজেল, মবিল ইত্যাদির ব্যবহার।	কার্বন মনো অক্সাইড ও অন্যান্য হাইড্রো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড NO_2, সীসা ইত্যাদি।
তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন	কয়লা	কার্বন কণা, ছাই, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি।
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, বয়লার ও কল-কারখানার চিমনি	কয়লা	একই, কখনও কখনও হাইড্রোজেন সালফাইড
চাষবাস	ধানচাষ ও সার ব্যবহার (জ্বালানি নয়)	মিথেন গ্যাস
পাথর ভাঙ্গা, খনির উপরি-তলের কাজ	বাতাসে ভাসমান বস্তু কণা	বাতাসে ভাসমান বস্তু কণা

বড় বড় শহরে যানবাহনের সংখ্যা ও অন্যান্য পরিস্থিতির উপর বায়ু দূষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। ঋতু অনুযায়ী তার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন, শীতকালে বাতাসে ভাসমান কার্বন কণা, ধুলো এবং কার্বন মনো অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে যা ধোঁয়াশা (Smog) নামে পরিচিত। অর্থাৎ কুয়াশা ও ধোঁয়ার মিলিত অবস্থানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে ওঠে। আবার বর্ষাকালে এর পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু বায়ুদূষণের উপরোক্ত কারণগুলি সমস্যাটির একটি দিক মাত্র।

অরণ্য ধ্বংস (Deforestation)—লোক বসতি ও চাষের প্রয়োজনে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন, দারিদ্রের কারণে জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহার করতে যেয়ে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation) ধ্বংস করা, ধর্মীয় সংস্কার বশত সৎকার প্রভৃতি কাজে কাঠের ব্যবহার এবং সৌখিনতার দরুন আসবাবের জন্য কাঠের ব্যবহার, এই সব কারণে দ্রুত আমাদের চারপাশের উদ্ভিদের অবনমন ঘটে চলেছে। কার্বন মনোঅক্সাইড উৎপাদনের পাশাপাশি বনাঞ্চল হ্রাসের ফলে বাতাসে CO-এর অনুপাত ক্রমবর্ধমান। যা শেষপর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে ওজোন স্তর (O_3) আছে, যা আমাদের ক্ষতিকর সৌরকিরণ থেকে রক্ষা করে, সেই ওজোন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্রমশ ওজোন স্তরকে ক্ষীণতর করে তুলছে। এর ফলে পৃথিবীর তাপ মাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তন, নানা রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। যতটা তাপ পৃথিবীতে শোষিত হচ্ছে তার সবটা CO-এর স্তর ভেদ করে বিকীর্ণ (Radition) হচ্ছে না। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এটাই প্রধান কারণ। এই জন্য ইতিমধ্যেই মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে যা ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের অগ্রিম সূচনা। উপরোক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বর্তমানে বলা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming)। অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার পরবর্তী প্রভাব মূলত বায়ুদূষণের কারণেই সৃষ্ট।

বায়ুদূষণের অন্যান্য প্রভাবগুলিও সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে নিচে আর একটি সারণিতে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

দূষণ (Pollutant)	প্রভাব (Effect)
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)	বিশ্ব উষ্ণায়ন, আবহাওয়ার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়
কার্বন মনো অক্সাইড (CO)	রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমায় কারণ CO সহজেই হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়।
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) ও ট্রাই অক্সাইড (SO_3)	অ্যাসিড বৃষ্টি, ফসল ও শারীরিক ক্ষতি
ফ্লোরাইড ও ফ্লুরোকার্বন	প্রথমটি উদ্ভিদের ক্ষতি করে, দ্বিতীয়টি রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। এটি ওজোন স্তরে ছিদ্র সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ
নাইট্রোজেন ঘটিত বিভিন্ন অক্সাইড	অ্যাসিড বৃষ্টি। শারীরিক ক্ষতি
হাইড্রোকার্বন, প্রধানত মিথেন (CH_4) ও ইথেন (C_2H_6)	শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা, ফুসফুসের ক্ষতি
ধোঁয়াশা (Smog)	শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষতি। রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ কমে।
তামাকজাত বস্তুর ধোঁয়া	শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষতি। ক্যান্সারের কারণ ও রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ

জল দূষণ (Water Pollution) —জলের সঙ্গে জৈব, অজৈব, দ্রবণীয়, অদ্রবণীয় যে কোন প্রকার এমন কোন বস্তুর উপস্থিতি যদি জলের ব্যবহারযোগ্যতা কমিয়ে দেয় এবং জলের গুণগত মান কমিয়ে দেয় তবে সেই জলকে দূষিত জল বলা হয়। জল দূষণের ফলে অধিকাংশ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়। জল দূষণের প্রধান কারণগুলি হল,

— স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে জলের সঙ্গে মাটি, বালি ইত্যাদি মিশে যায়, যা স্বাভাবিক নিয়মেই থিতিয়ে পড়ে।

— বাড়ি ও গৃহস্থালীর বর্জ্য মিশ্রিত জল। বাড়ির নর্দমা থেকে নির্গত সাবান, কিছু কিছু রাসায়নিক, তৈল জাতীয় বস্তু, ছাই, শারীরিক বর্জ্য এই সব শেষ পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে মূল জলধারার সঙ্গে মিশে যায়।

— কল কারখানার বর্জ্য। কল কারখানা থেকে নানা রাসায়নিক বর্জ্য মিশ্রিত জল অপরিশোধিত অবস্থায় ভূগর্ভস্থ জলে অথবা উপরিতলের জলের উৎসগুলির সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে। এই বর্জ্যে পারদ, সীসা, তামা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু ও ধাতব যৌগ ছাড়াও অ্যাসিড ও ক্ষার নানাভাবে জীব জগতের ক্ষতি সাধন করে। কিছু কিছু জৈব যৌগ যেমন, ফেনল, ন্যাপথা, সেলুলোজ তন্তু ও অ্যারোমেটিক যৌগও (বন্ধ কার্বন শৃংখল যুক্ত অণু) দূষণের অন্যতম কারণ।

— কৃষি ক্ষেত্রের দূষণ। প্রধানত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার কৃষি ক্ষেত্রের জলের সঙ্গে মিশে পরে তা মূল জলধারাকে দূষিত করে তোলে। কীটনাশক ছোট ছোট কীট পতঙ্গের পাশাপাশি কৃষি সহায়ক কীট পতঙ্গকেও ধ্বংস করে। পাখি ও অন্যান্য প্রাণিরা খাদ্যের অভাবে অথবা মৃত কীট খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

— স্বাভাবিক জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা কিছু কিছু অন্যান্য শিল্পে প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হয়। এর পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণ গরম জল তারা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয় যা শেষ পর্যন্ত বহু প্রাণির মৃত্যুর কারণ হয় এবং আবহাওয়াকে উষ্ণ করে তোলে।

সংক্ষেপে, জল দূষণের ফলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তার কয়েকটি হল,

— রোগ জীবাণুর আধিক্য ও স্বাস্থ্যহানি।

— ক্যান্সার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি।

— স্নায়বিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

— পারদ ক্রোমোজোমের বিভাজনে বাধা দেয় এবং জেনেটিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

— শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (লিভার, কিডনি ইত্যাদি) ক্ষতি।

— উদ্ভিদ ও জীব কুলের বিলোপ।

— পাখির ডিমের খোলা নরম হয়ে বংশবৃদ্ধিতে বাধা।

— চর্মরোগ, আর্থারাইটিস প্রভৃতি রোগ।

— উষ্ণায়ন ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা।

● **মৃত্তিকা দূষণ (Soil Polution)** — জল দূষণের কারণগুলি মৃত্তিকা দূষণেরও কারণ। মাটির সঙ্গে নানা রকম বর্জ্য পদার্থ মিশে মাটিকে অ্যাসিড অথবা ক্ষারধর্মী করে তোলা, অবাঞ্ছিত জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ঘটানো, জমিকে লবণাক্ত করে তোলা, অথবা মাটিতে এমন ধরনের ধাতব যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি যা উৎপন্ন ফসল, ফলমূল প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের ও প্রাণি দেহে সঞ্চারিত হয়ে বিপদ ডেকে আনে, এই সবই মৃত্তিকা দূষণের পরিণাম। আর এক ধরনের মৃত্তিকা দূষণের ফলে ভূমিক্ষয় ও মাটিতে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের (minerals) অভাব ঘটায়। ভূমিক্ষয় মূলত উদ্ভিদের বিনাশ ও অরণ্য ধ্বংসের দরুন ঘটে আর খনিজ পদার্থের অভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও বংশ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি হয়।

● **শব্দ দূষণ (Sound or Noise Pollution)** — বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রধান অভিশাপ শব্দ দূষণ। মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা ২০ হার্জ (HZ) থেকে ২০০০০ হার্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। শব্দের তীব্রতাকে ডেসিবেল (dB) দ্বারা মাপা হয়। একটু জোরে কথাবার্তা বললে তার তীব্রতার মান হয় ৬০ dB। যখন কোন শব্দ ৮০ dB ছাড়িয়ে যায় তখন তাকে শব্দদূষণ বলা হয়। ১০০ dB যুক্ত শব্দ অসহ্য মনে হয়।

মানুষ প্রতি নিয়ত শব্দ সৃষ্টি করে চলে। বাড়িতে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতি (মিক্সার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি, অনেক লোকের সমবেত চিৎকার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির অত্যন্ত জোরে শব্দ, এই সব শব্দ দূষণের একধরনের কারণ।

লাউড স্পীকার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদের জন্য শব্দ, যেমন রক সঙ্গীত, বাজি পটকার শব্দ ইত্যাদি, শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। পাম্প, ট্র্যাক্টর, যানবাহন চলাচলের শব্দ (মোটর গাড়ি, বাইক, বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি), খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানো এইগুলিও শব্দ দূষণের কারণ। কল কারখানার যান্ত্রিক শব্দ, গৃহ নির্মাণের শব্দ, পাথর ভাঙ্গার শব্দ, রাস্তা তৈরির রোলার এরকম অসংখ্য শব্দ উৎপাদনের উৎস বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। বিশেষভাবে সমস্যা এই যে মানুষ অপ্রয়োজনে শুধুমাত্র আমোদের জন্য ক্রমাগত নিজের ক্ষতি করেও শব্দ সৃষ্টি করে চলে। শব্দদূষণের প্রভাব অনেক দূর বিস্তৃত।

— শব্দ দূষণ বধিরতার কারণ। বর্তমানে শহরাঞ্চলে তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও যেখানে ঘনবসতি বর্তমান, সেখানেও বধিরতার প্রকোপ ক্রমাগত বর্ধমান।

— রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদ্‌স্পন্দনের গতি দ্রুত হওয়া এবং রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি, শব্দ দূষণের অন্যতম ফল।

— মনঃসংযোগে বাধা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা এসব উপসর্গ দীর্ঘকাল যাবৎ শব্দ দূষণের ফলে দেখা যায়।

— কোন কোন ক্ষেত্রে হজমের গোলমাল, পেপটিক অলসার জাতীয় রোগের সঙ্গে শব্দ দূষণের সম্পর্ক পাওয়া যায়।

— শব্দ দূষণ মানুষের অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও কখনও কখনও উদ্বেগ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষই দূষণের কারণগুলি বিস্তারিত জেনে নিয়ে একভাবে নিজের আচরণ ও সমষ্টিগতভাবে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে। প্রত্যেকটি দূষণের প্রতিকার ব্যক্তি বা ছোট জনগোষ্ঠীর হাতে নেই। কল কারখানা, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদি থেকে যে দূষণ ঘটে তার নিয়ন্ত্রণ করা একটি রাষ্ট্রের নীতি, আইন, প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও তৎপরতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সেজন্য ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ উদ্যোগ তুচ্ছ হয়ে যায় না। তার জন্য প্রাথমিকভাবে চাই পরিবেশের জন্য প্রকৃত উদ্বেগ। দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ ভাবে ছাত্রছাত্রীরা যে ভূমিকা পালন করতে পারে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল।

- বৃক্ষরোপণ ও পালন—ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও পালন করা। যেমন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গাছ লাগানো ও তার যত্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সূচনা করা যেতে পারে।
- বন্য সৃজন আন্দোলন — সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা ও উপযুক্ত নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা।
- কল কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য যাতে সঠিকভাবে পরিশোধিত হয় তার জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা।
- প্রাণি কুলের রক্ষার জন্য যত্নবান হওয়া।
- পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হয়ে দূষণের উৎসগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।
- অকারণ শব্দ দূষণ বন্ধ করার উদ্যোগ।
- জৈবসার যুক্ত খাদ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও অভ্যাস গড়ে তোলা।
- অপচয় বন্ধ করা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অকারণে দূষণ জনিত সমস্যা নিরসনের চেষ্টা।
- চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

7.3.2 সম্পদের অবক্ষয় (Depletion of Resources)

জনসংখ্যা শিক্ষায় (Population Education) সম্পদ কি সে সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান মানুষের প্রয়োজনে অর্থাৎ তার চাহিদা মেটানোর জন্য কাজে লাগে তাকেই বলা হয় সম্পদ। অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক উপাদান কোন কাজে লাগে না তাকে সম্পদ বলা চলে না। এখানে চাহিদা পূরণ কথাটি কোন তাৎক্ষণিক অর্থে বলা হয়নি। যে প্রাকৃতিক উপাদান কোন বিশেষ সময়ে চাহিদা পূরণ না করলেও সম্ভাবনাযুক্ত তাকেও সম্পদ বলা হয়। যেমন, খনি থেকে তোলা হয়নি এমন খনিজ বস্তুও সম্পদ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রকৃতিই মানুষের সমস্ত সম্পদের উৎস। মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু সম্পদের রূপান্তর ঘটিয়ে কৃত্রিম সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে।

সম্পদের শ্রেণি বিভাগ (Classification of Resource)

রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদ তিন প্রকার। যথা,

— অজৈব (Inorganic) সম্পদ, যেমন, জল, খনিজ ধাতু ইত্যাদি।

— জৈব (Organic) সম্পদ, যেমন, উদ্ভিদ, প্রাণি, জীবাশ্ম জ্বালানি ইত্যাদি।

— মিশ্র (Mixed), যা একাধারে জৈব ও অজৈব। আমাদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ সম্পদই জৈব এবং অজৈব এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

রাজনৈতিক বিভাগের ভিত্তিতে সম্পদ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

— জাতীয় (National), যেমন, ভূমি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। এগুলিতে একমাত্র অধিকার দেশের সীমারেখার ভিত্তিতে কোন একটি রাষ্ট্রের।

— বহুজাতিক (Multinational), যেমন একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী, হ্রদ, পরিযায়ী প্রাণি ইত্যাদি।

— আন্তর্জাতিক (International), যেমন, বায়ু, সৌরশক্তি, মহাসাগর ইত্যাদি।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বহুল প্রচলিত শ্রেণি বিভাগ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে!

— অসীম বা অফুরন্ত (Inexhaustible) সম্পদ, যেমন, বায়ু শক্তি, সৌরশক্তি, সমুদ্রের ঢেউ থেকে পাওয়া শক্তি ইত্যাদি।

— সীমিত (Exhaustible) সম্পদ। অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদই এই শ্রেণিভুক্ত কারণ এই জাতীয় সম্পদ এক সময় না এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের প্রধানতম ক্ষেত্রটি এখানেই। সীমিত সম্পদ আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

(ক) পূরণযোগ্য (Renewable) — এই জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করলেও আবার তার পুনরুৎপাদন সম্পদ। কৃষিজ সম্পদ, অরণ্য, গৃহপালিত প্রাণি, খাদ্যের জন্য চাষ করা মাছ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হলেও যথাযথ ব্যবস্থা নিলে তার পুনরুৎপাদন সম্ভব।

(খ) অপূরণযোগ্য (Non renewable) — এই জাতীয় সম্পদ নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং প্রকৃতিতে সঞ্চিত যে ভাণ্ডার আছে তা ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে কমে যায় এবং একদিন শেষ হয়ে যায়। পৃথিবীর খনিজ সম্পদ (খনিজ ধাতু সমূহ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) অপূরণযোগ্য সম্পদ। কোন কোন ধাতু এখনই প্রায় নিঃশেষিত। পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয়ও উদ্বেগজনক।

অপূরণযোগ্য সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার হলে সম্পদের পরিমাণ স্বাভাবিক নিয়মেই দ্রুত কমতে থাকে। আবার পূরণযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যয় যদি পুনরুৎপাদনের তুলনায় বেশি হয় তাহলেও সম্পদের ক্রমাগত ঘাটতি হতে থাকে। একেই বলা হয় সম্পদের অবক্ষয় (Depletion of resource), প্রশ্ন হল সম্পদ কিভাবে ব্যয়িত হয় অর্থাৎ কেন সম্পদের অবক্ষয় ঘটে?

শক্তি (Energy) — মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। আবার তার মধ্যে প্রধান হল তাপ শক্তি। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা শরীরে তাপ শক্তি উৎপাদন করে। দেহ সচল রাখার প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক শক্তির জন্যও তাপ দরকার। জ্বালানি হিসাবে বিপুল পরিমাণ কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে তাপশক্তি উৎপাদন করা হয়। বিদ্যুৎ শক্তির জন্যও দরকার জ্বালানির। যানবাহন, কল কারখানা, দৈনন্দিন গৃহস্থালীর প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে অনরবত। তার ফলে একদিকে বাড়ছে দূষণ অন্যদিকে সম্পদের অবক্ষয় তীব্র আকার ধারণ করেছে।

শক্তি উৎপাদনের জন্য যে ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী শক্তি পূরণযোগ্য (Renewable)

এবং অপূরণযোগ্য (Non renewable) এই দুই প্রকার হতে পারে। অরণ্যের কাঠ ও ঝরা পাতা থেকে উৎপন্ন শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এগুলি পূরণযোগ্য। আর কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন শক্তি অপূরণযোগ্য।

শক্তির প্রয়োজনে সম্পদের অবক্ষয় রোধ করার প্রধান উপায় সংরক্ষণ (Conservation)। সংরক্ষণের জন্য তিনটি প্রধান পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে এবং বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

(ক) অপূরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে আনা, প্রযুক্তির উন্নতি, অপচয় নিরোধক ব্যবহার বিধি, ভোগ্যপণ্যের যৌথ ব্যবহার, প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষণ হতে পারে। গৃহস্থালীর কাজে শক্তির অপচয় ঘটে প্রচুর। রন্ধনশৈলীর পরিবর্তন করে অন্ততঃ ৩৫-৪০% জ্বালানি বাঁচানো যায়। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারও অনেকটা কমানো সম্ভব এবং এবিষয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনকারী সংস্থাগুলির উপদেশ মেনে চলা উচিত। তবে বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের অপচয় ঘটে সে বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(খ) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার অপ্রচলিত শক্তি (Non-Conventional energy) যা বিকল্প শক্তি হিসাবেও পরিচিত, অর্থাৎ, বায়ু প্রবাহের শক্তি, সমুদ্রের জোয়ারের (Tidal) শক্তি, সৌর শক্তি, পশু বর্জ্য থেকে উৎপন্ন গ্যাসও শক্তি (যেমন, গোবর গ্যাস ও বিদ্যুৎ) ইত্যাদিকে বোঝায়। এই সব শক্তি একদিকে যেমন অফুরন্ত তেমনি পূরণযোগ্য। সবচেয়ে বড় সুবিধা, অপ্রচলিত শক্তি দূষণ মুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব।

(গ) অন্যান্য বিকল্প শক্তির (Other alternative energies) যার কিছুটা ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে, সম্ভাবনাও বিপুল। প্রধান বিকল্পগুলির কয়েকটির নাম দেওয়া হল।

— জল বিদ্যুৎ (Hydroelectricity) আমাদের স্বাধীনতার পর থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতের প্রথম জল বিদ্যুৎ প্রকল্প ভাকরা-নাঙ্গাল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রভৃতি রাজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

— সৌর শক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে, ফটোভোল্টাইক কোষ ও সিলিকন প্রযুক্তির সাহায্যে বর্তমানে দেশের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

— বায়ুশক্তি, বিশেষত: সমুদ্র বায়ুর সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

— পারমাণবিক শক্তি (Nuclear Energy) একটি বিতর্কিত কিন্তু বিপুল শক্তির উৎস। বিতর্কের প্রধান বিষয় পারমাণবিক বর্জ্য ও তার দূষণ, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ জনিত সমস্যা।

— সামুদ্রিক তাপ শক্তির রূপান্তর (Ocean Thermal Energy Conversion) অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উপরিতলের তাপমাত্রার সঙ্গে গভীর অংশের তাপমাত্রার বিরাট পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

— কৃষিজ শক্তি (Agricultural Energy) কথাটির অর্থ যে সব শ্বেতসার যুক্ত কন্দ থেকে (যেমন, আলু, বীট ইত্যাদি) অ্যালকোহল তৈরি করা যায় সেই সব ফসলের চাষ বাড়িয়ে এবং পেট্রোলের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশিয়ে জ্বালানির সংরক্ষণ করা। আবার কিছু কিছু উদ্ভিজ্জ তেল (যেমন, Jatropha) পরিশোধিত অবস্থায় পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে শক্তি ও জ্বালানির সাশ্রয় করা যায়।

— জল থেকে হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট করে তাকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালানো হচ্ছে।

ভূমি সম্পদ (Land Resource) — সমুদ্র, নদী, হ্রদ ও অন্যান্য জলাশয় বাদে পৃথিবীর উপরিতলে যে অবশিষ্ট স্থান আছে, তাকে বলা হয় ভূমি সম্পদ। আমাদের দেশের মোট আয়তনের ৪৩% কৃষি জমি, ২৩% বনাঞ্চল, তৃণভূমি ৪% এবং ৮% লোক বসতি। অবশ্য এই অনুপাত ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। ভূমিকে অন্যতম প্রধান সম্পদ বলার কারণ

এই যে মানুষের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ভূপৃষ্ঠের উপরই অনুষ্ঠিত হয়। জমির ব্যবহার প্রণালী অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক দেশই তাদের অধীনস্থ ভূসম্পদ সম্বন্ধে নানা নীতি প্রণয়ন করে জমির ব্যবহার প্রণালী (Land use pattern) নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই সব নীতির মূল কথা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

— অরণ্য অঞ্চলের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখা অথবা সম্ভব হলে বাড়ানো।

— বসবাস ও কলকারখানার জন্য স্বতন্ত্র অঞ্চল নির্ধারিত করা।

— নগরায়ণ ও গ্রামীণ বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

— পরিকল্পিতভাবে কৃষিজমিতে চাষ করা এবং কৃষি জমিকে অন্য প্রকার ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা।

— ভূমির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব তার সম্পদ মূল্যকে কাজে লাগানো।

এই জাতীয় নীতির উপযোগিতা বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ খাদ্য সরবরাহ, কৃষিপণ্য ভিত্তিক অর্থনীতি, অরণ্য সম্পদের সামঞ্জস্য পূর্ণ ব্যবহার, পরিবেশের উন্নয়ন, ইত্যাদি সব কিছুই ভূমি সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন হল ভূমি সম্পদের অবনতি হয় কেন, এবং তার প্রতিকার কি? এখানে কয়েকটি উত্তর তুলে ধরা হল:

(ক) জমির উর্বরতা হ্রাস (Reduction of Social Fertility) — অত্যধিক চাষ, ভুল প্রথায় চাষ, অতিরিক্ত ফলনের আশায় ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার এই সব কারণে জমির স্বাভাবিক চরিত্র নষ্ট হয় এবং তার উর্বরতা হ্রাস পায়। তা ছাড়াও কৃষি জমির কাছাকাছি কলকারখানা থাকলে, দূষিত বর্জ্য, ছাই ইত্যাদি জমির উর্বরতা নষ্ট করে। এর ফলে ক্রমশ জমির উৎপাদন কমতে থাকে। কোন কোন জমি বন্ধ্যা জমিতেও রূপান্তরিত হতে পারে।

এই অবস্থায় প্রতিকার করার অন্যতম উপায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিন্ন ফসলের চাষ (Rotational cropping) করে জমির উর্বরতা বজায় রাখা। জৈব সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে সুতরাং রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। চাষ করার সময় উপর এবং নিচের মাটি বার বার স্থান পরিবর্তন করলে, অনেক সময় উর্বরতা বজায় রাখা সহজ হয়। তাছাড়াও সেচের জন্য ব্যবহৃত জলের গুণগত মান, কাছাকাছি কল কারখানা, তৈল সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠান (যেমন, পেট্রোলিয়াম ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন সম্ভাবনাযুক্ত প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি সম্বন্ধেও সতর্ক থাকা দরকার।

(খ) ভূমিক্ষয় (Soil erosion) — সাধারণভাবে পাহাড়ের অরণ্য ধ্বংস হলে ক্রমাগত ভূমিক্ষয় হতে থাকে। নদীর ভাঙ্গন, সমুদ্রের বালি উড়ে এসে ক্রমাগত মাটির উপরিতল ঢেকে দিলে, মাটি কেটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভূমিক্ষয় হয়। ভূমিক্ষয়ের বিস্তার, পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার ফলাফল। বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বাদ দিলেও, অনেক সময় মাটির চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায় (যেমন, মৃত্তিকা সরে গিয়ে পাথুরে মাটি বেড়িয়ে পড়া)। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা বৃক্ষরোপণ ও লালন, অরণ্য সংরক্ষণ, নদী পরিকল্পনা ইত্যাদি।

জল সম্পদ (Water Resource) — পৃথিবীর মোট ৭৭% উপরিতল জল এবং বাকি ২৩% স্থলভূমি। কিন্তু মোট জলের বৃহত্তম অংশ মেরু অঞ্চলে, পর্বতশীর্ষে এবং হিমবাহগুলিতে বরফের আকারে সঞ্চিত আছে। মোট জলের ২২.৪% ভূপৃষ্ঠে থাকলেও তার অধিকাংশই সমুদ্রের নোনা জল। সামান্য অংশ (৩.৬%) মাত্র মিষ্টি জলের উৎস। জলের একটি প্রধান সঞ্চয় রয়েছে ভূগর্ভে। এই জল বাষ্পীভূত হয় না, উদ্ভিদও শোষণ করে না কিন্তু মানুষ পাম্প করে তুলে নিতে পারে। জল পুরণযোগ্য সম্পদ কারণ জলের বাষ্পীভবনের ফলে যতটা হ্রাস ঘটে বৃষ্টিপাতের ফলে

তা আবার ফিরে অসে। বৃষ্টি জলের একটা অংশ ভূগর্ভস্থ-জলস্তরে ফিরে যায়। সুতরাং জলের উত্তোলন ও ব্যয় যদি সঞ্চয়ের তুলনায় বেশি হয় তবে ক্রমাগত জলের স্তর নিচে নামতে থাকে এবং নানা বিপর্যয় ডেকে আনে।

জল মানুষের এবং সমস্ত জীবিত প্রাণি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের অপরিহার্য বস্তু। খাদ্যহীন অবস্থায় প্রাণি কয়েকদিন বাঁচলেও জল ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। জলের ব্যবহারের ক্ষেত্র বিরাট ও বিস্তৃত।

— পানীয় জল।

— কৃষিকার্যের জন্য জল।

— কলকারখানার জন্য জল।

— পরিচ্ছন্নতার জন্য জল।

— বিদ্যুৎ উৎপাদন।

— বাসস্থান নির্মাণের জন্য জল।

কৃষিকাজের জন্য জলের বিপুল চাহিদার জন্যই সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আবার নদীর মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু সভ্যতাও ধ্বংস হয়েছে।

জলদূষণের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময় জল নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ কিছুটা বলা হয়েছে। সম্পদ হিসাবে জলের সমস্যাগুলির আরও কয়েকটি এখানে বলা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক অসাম্য (Natural unevenness) — সারা বছর সর্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না। যে সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, তখন তা ধরে রাখা যায় না, আবার যখন বৃষ্টি হয় না তখন প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় না। অধিক ও স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।

— জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুন জলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার দরুন মাথাপিছু জলের ব্যবহারও বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিপুল ঘাটতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

— ক্রমগত নগরায়ণের ফলে পানীয় ও অন্যান্য জলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

— খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলন এমন বেশি হারে ঘটছে যে প্রায়ই ভূগর্ভস্থ জল প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

— জল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার পথে এবং জল সম্বন্ধে অবহেলার মনোভাব থাকায় বিপুল পরিমাণ জলের অপচয় ঘটে।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও, নানাভাবে দূষিত হয়ে পড়ায় জল সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় ঘটছে। তার কয়েকটি এখানে আবার উল্লেখ করা হল।

— সমুদ্রের জলে তৈল স্তর সঞ্চিত হয়ে সামুদ্রিক প্রাণিদের অস্তিত্ব সংকট সৃষ্টি করে।

— ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থের বিপজ্জনক উপস্থিতি।

— নদীদূষণ বহু নদীর জলকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

— ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় দ্রুত কমে গিয়ে ভূস্তরের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। সমতলে ধস নামার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলের জল নিচু অঞ্চলের ভূস্তরে সরে আসায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

— অপব্যবহারের দরুন ছোট জলাশয়গুলির জল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে।

জল সম্পদ রক্ষার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা নেওয়া দরকার তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির ধারণা দেওয়া হল।

— ভূগর্ভস্থ জলস্তরের সঞ্চয় পরিমাপ করে ব্যবহার বিধি প্রণয়ন করা এবং শহরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা দরকার।

— বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নেওয়া এবং আইন প্রণয়ন করা দরকার।

— কলকারখানা ও শহরাঞ্চলের বর্জ্য জল পরিশোধিত করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এই জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গবেষণাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

— যে সমস্ত চাষে জল কম লাগে এমন ধরনের বীজ উৎপাদন করে চাষের রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন। কম জলে ধান চাষ করার কিছু কিছু প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সাফল্য পেয়েছে।

— সমস্ত রকম অপচয় অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এই বিষয়ে ব্যাপক গণচেতনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে এখনই।

— বনসৃজনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। সেই সঙ্গে উষ্ণায়ন যত কম হবে ততই মেরু অঞ্চলে এবং হিমবাহগুলিতে সঞ্চিত বরফের সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে।

— বাস্তব সম্মত ও কার্যকর নদী পরিকল্পনা (River planning) রচনা করা দরকার। আমাদের দেশে উত্তর ও পূর্বভারতের নদীগুলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির সংযোগ সাধন করার একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তব সম্মত ছিল না এবং বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় লাভজনক বলে মনে করা হয়নি।

সামুদ্রিক সম্পদ (Marine Resource) — সমুদ্র অফুরন্ত সম্পদের আকর। সমুদ্র স্রোত, বিশেষভাবে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের গতি ভূমণ্ডলের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে (এল-নিনো বা অনুরূপ প্রভাবের কথা স্মর্তব্য)। সমুদ্র বায়ু যে জলীয় বাষ্প নিয়ে স্থল ভাগে প্রবাহিত হয় তার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় এবং পৃথিবীর মিষ্টি জলের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখে। নিরক্ষীয় জল বায়ু, ক্রান্তীয় জলবায়ু, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ইত্যাদি বিভাজনগুলির ক্ষেত্রে বায়ু প্রবাহ ও জলকণার উপস্থিতির প্রসঙ্গটি প্রধান। সকল জলবায়ুর ক্ষেত্রেই সমুদ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। যে সমস্ত কারণে সমুদ্রকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়, পূর্ববর্তী অংশগুলিতে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

— খাদ্যের উৎস (Source of Food) — সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণি মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সবই আয়োডিন যুক্ত খাদ্যের প্রধান উৎস। এছাড়াও সামুদ্রিক উদ্ভিদ (যেমন, কিছু কিছু শৈবাল বা algae) খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

— ঔষধ (Medicine) — বিজ্ঞানীরা মনে করেন সমুদ্রের বহু উদ্ভিদ ও প্রাণি ঔষধের জৈবিক উৎস হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কড, হেরিং প্রভৃতি মাছের তেলকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

— শক্তির উৎস (Source of Energy)— সমুদ্রের ঢেউ এবং স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

— **পরিবহন (Trans/port)** — জাহাজ ইত্যাদি সামুদ্রিক জলযান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। মানুষ ও নানা বস্তুর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমুদ্র অপরিহার্য মাধ্যম।

— **লবণের উৎস (Source of Salt)** — সমুদ্র মানুষ ও প্রাণির লবণের চাহিদা সবটাই মেটায়।

— **খনিজ (Mineral)**— সমুদ্রের তলদেশের মাটি খনিজ সম্পদে ভরপুর। তবে পেট্রোলিয়াম ছাড়া আর কোন খনিজ উত্তোলন করা হয় না।

— মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতির উৎসও সমুদ্র। এছাড়া সমুদ্র প্রাণি জগতের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সামুদ্রিক সম্পদের অবক্ষয় নানা কারণে ঘটে থাকে।

(ক) নদী বাহিত পলিমাটি সমুদ্রে সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ চর সৃষ্টি করে এবং নাব্যতা নষ্ট করে। এর ফলে নতুন ভূমি সৃষ্টি হলেও সমুদ্র দূরে সরে যায়, অন্যদিকে উপকূলের ভাঙন ধরে।

(খ) শহর ও শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য পদার্থ, বিশেষত জৈব পরিবর্তনরহিত বর্জ্য পদার্থ, ক্রমাগত সমুদ্র জলকে ভয়াবহ দূষণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তার প্রভাব পড়ছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রাণি ও সমুদ্রনির্ভর স্থলচর প্রাণি ও পাখিদের উপর।

(গ) একইভাবে বিষাক্ত রাসায়নিক (Toxic chemicals) দূষণ সামুদ্রিক প্রাণিদের ধ্বংসের কারণ।

(ঘ) বন্দর অঞ্চলে, প্রধানত তৈল বন্দর এলাকায়, সমুদ্রের জলে ভাসমান তেলের আস্তরণ থাকায় জলে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত হতে পারে না। এইজন্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায় তাদের উপর নির্ভরশীল প্রাণিকুল লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই সব ক্ষেত্রে প্রতিকার হিসাবে বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন ও নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে জরুরি। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া তেলের আস্তরণ থেকে তেল নিষ্কাশন করার পদ্ধতি উন্নত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সমুদ্রের প্রাণি ও উদ্ভিদের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার কারণ তিমি প্রভৃতি বহু জলচর প্রাণির অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resource) — সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির জন্য যে সব বিষয়ের অবদান বেশি তার মধ্যে অন্যতম হল ভূগর্ভ থেকে খনিজ ধাতু ও জ্বালানি উত্তোলনের ও নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, তামা, লোহা, সোনা, রুপা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু ও জ্বালানি মানব সভ্যতার ভিত্তি। কিন্তু আদিম কাল থেকে ক্রমাগত খনিজ পদার্থ তুলে নেওয়ার ফলে, বিশেষত বিগত শতাব্দী থেকে এদের ব্যবহার অপরিমিত হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ খনিজ পদার্থই এখন শেষ হওয়ার মুখে।

কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের মজুত এতই সীমিত যে বিকল্প জ্বালানির উৎস খোঁজা ও তার প্রযুক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞানীরা দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন। সৌর শক্তি ও অন্যান্য শক্তির কথা ইতিমধ্যেই অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখনও উদ্বেগ নিরসনের কোন সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। ধাতুগুলির মধ্যে তামা ও নিকেল প্রায় নিঃশেষিত। তামার অন্যতম প্রধান ব্যবহার ছিল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে। বিকল্প ধাতু হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম, সম্ভবপর ক্ষেত্রে ফাইবার গ্লাসের ব্যবহার ও অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে। গবেষণাও চলছে সারা দুনিয়াময়।

এসব পদক্ষেপ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার।

(ক) অপচয় বন্ধ করা, উত্তোলন ও পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই।

(খ) পরিশোধন ও নিষ্কাশনের সময় উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধাতুর উৎপাদন নিশ্চিত করা।

(গ) ব্যবহারের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঘ) পুনর্ব্যবহার (Recycling) যত বেশি সম্ভব নিশ্চিত করা।

(ঙ) বিকল্প সন্ধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

অরণ্য সম্পদ (Forest Resource) — অরণ্য সম্পদ কথাটির অর্থ একাধারে উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্পদের সমাহার, সহাবস্থান ও পরস্পর নির্ভরশীলতা মিলিয়ে যে সম্পদ আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাই। যদিও অরণ্যের সম্পদমূল্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে তবুও বিষয়টি উল্লেখ করা আবশ্যিক।

— অরণ্য ও সমুদ্র মিলিত ভাবে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যের (Biodiversity) ধারক ও প্রতিপালক। উদ্ভিদ বৈচিত্র্য (Flora) এবং প্রাণি বৈচিত্র্য (Fauna) মিলিয়ে জীব বৈচিত্র্য। যেকোন অরণ্যে যত রকমের উদ্ভিদ পরস্পরের সহায়তায় বেঁচে থাকে এবং বংশ বিস্তার করে তার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। আবার ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রাণি পর্যন্ত সবই অরণ্যের আশ্রয়ে লালিত হয়।

— আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে অরণ্যের ভূমিকা আজ সকলেরই জানা। বৃষ্টিপাত অরণ্য ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক নিয়মেই বেশি। পৃথিবী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অরণ্যই প্রধান শক্তি। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global warming) নিয়ন্ত্রণ এক মাত্র অরণ্য সৃজনের সাহায্যেই সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

— বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও অরণ্যই প্রধান। বৃক্ষহীন ঘনবসতি অঞ্চলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ স্বভাবতই বেশি।

— অর্থনীতির দিক থেকে অরণ্য যে কোন দেশের পক্ষে স্তম্ভস্বরূপ। প্রত্যক্ষভাবে, অরণ্য থেকে সংগৃহীত সম্পদ বহুমানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কাঠ, গাছের পাতা, ফুল, ফল, মধু, প্রাণিজ অন্যান্য উপকরণ ছাড়াও ভ্রমণ শিল্প, অরণ্য সংরক্ষণ, ইত্যাদি অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতির উপর অরণ্যের পরোক্ষ প্রভাবও কম নয়।

কিন্তু অরণ্য সম্পদ ধ্বংস করার ঝোঁকও পাশাপাশি প্রবলভাবে উপস্থিত। এর কারণ

— জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির ফলে অরণ্য অঞ্চলে বাসভূমির বিস্তার।

— কৃষির জন্য জমি বাড়াতে গিয়ে অরণ্য দখল।

— অতি লোভে গাছপালা কেটে বিক্রি করা।

— জ্বালানির জন্য গাছ কাটা।

— সৌখিনতার দরুন কাঠের আসবাব, দরজা জানালা ইত্যাদির প্রয়োজনে গাছ কাটা।

— চোরা শিকার করে বন্যপ্রাণি নিধন।

— জল বিদ্যুতের প্রয়োজনে নদী বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করতে যেয়ে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল একযোগে জলের নিচে চলে যাওয়া (এর উদাহরণ—উত্তরা খণ্ডের টিহরি বাঁধ)।

— ভূমিক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হওয়া বন্যা, ধস ইত্যাদির দরুন অরণ্য ধ্বংস হওয়া।

অরণ্য সংরক্ষণ ও বনাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি করা আজকের পরিবেশবিদ্‌দের প্রধান চিন্তার বিষয়। কিছু কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা অরণ্য সংরক্ষণের জন্য আশু প্রয়োজন।

(ক) কাঠের ব্যবহার যথা সম্ভব কমানো। আমাদের দেশের গরীব মানুষের প্রধান জ্বালানি বন থেকে সংগৃহীত কাঠ। মৃতদেহ দাহ করার প্রথা ও কুসংস্কারের দরুন প্রচুর কাঠ পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

(খ) কাঠের বিকল্প হিসাবে গৃহনির্মাণে, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক ইত্যাদির ব্যবহার এখন বহুল প্রচলিত।

(গ) অরণ্য অঞ্চল বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের বন সৃজন পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, নাগরিক বনসৃজন (Urban forestry), বিনোদন মূলক বনসৃজন (Entertaining forestry) ইত্যাদি। কিন্তু মূল অরণ্য অঞ্চল যাতে সংকুচিত না হয় এবং তার মৌলিক চরিত্র যাতে না পরিবর্তিত হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

(ঘ) এই কাজে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করা দরকার। তৎকালীন উত্তর প্রদেশে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে যে, চীপ্‌কো আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, (১৯৭২-৭৪), অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূর প্রসারী। চীপ্‌কো আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং সুন্দরলাল বহুগুণা ও তার সহ আন্দোলনকারীরা অরণ্য সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন, সরকারি পদ্ধতির পরিবর্তন, এবং বহু অবাঞ্ছিত পরিকল্পনা বাতিল করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন।

7.3.3 জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth)

জনসংখ্যা শিক্ষায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের অবনতির সম্পর্ক অনেকটা আলোচনা করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ। প্রথমে সংক্ষেপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে চলেছে সে বিষয়গুলি তুলে ধরা দরকার।

- কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধি করার দরুন ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, যার পরিণাম সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।
- অধিক ফলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে কারণ কম জমিতে বেশি ফসল উৎপাদন না করতে পারলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যাবে না। এর ফলে বেশি করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় মাটির ও ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ ঘটছে। খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণি দেহেও দূষণ ঘটছে।
- ধানচাষের উপজাত বস্তু হিসাবে বাতাসে মিথেন জাতীয় গ্যাসের অনুপাত ক্রমাগত বাড়ছে।
- নতুন বাসস্থান, কল কারখানা স্থাপন করে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করতে যেয়ে আরও বেশি করে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অরণ্যভূমি কমছে এবং উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- পারিবারিক ও নাগরিক বর্জ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (Waste management) এক বিরাট সমস্যা। বিশেষত এর একটা প্রধান অংশ জৈব পরিবর্তন রহিত দ্রব্য। প্লাস্টিক, যন্ত্রপাতির পরিত্যক্ত অংশ, গাড়ির দূষণ পরিবেশের বিপদ-ডেকে আনছে।
- যে সব ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার দূষণ ছড়ায় তার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে পরিবেশের পক্ষে তা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। ধোঁয়া, শব্দ, ফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি উপজাত বস্তু ভোগ্য পণ্যের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জল সম্পদের ক্ষয় অবধারিতভাবেই যুক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জলের প্রয়োজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তার দরুন ভূগর্ভস্থ-জল উত্তোলন বাড়ে। জলস্তর নিচে নেমে গিয়ে নানা বিপর্যয় ডেকে আনে। তাছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, জলের অপচয় এবং দূষণও ক্রমাগত বাড়ে।

- এক কথায় জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পরিবেশের পক্ষে অন্যতম প্রধান বিপদের কারণ।

- **জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যার প্রতিকার (Remedies of Problems related to population growth)**— জনসংখ্যা শিক্ষার শুরুতে বলা হয়েছিল যে জনসংখ্যাকে প্রথম থেকেই আপদ বা সমস্যা হিসাবে দেখা হলেও, পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রথম ধাপ হল শিক্ষা। মানুষ যত বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত হবে ততই তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে এটা প্রায় প্রমাণিত সত্য। পরিবেশ শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটা বিষয়। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত পরিশীলিত পরিবেশ ভাবনা এবং পরিবেশচেতনা আমাদের চারপাশের জগৎকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে শেখায়। তখন পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সহজ হয়। অন্যান্য প্রতিকারের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

— প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা সংক্রান্ত এবং জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করা ও কার্যকর করা। এই বিষয়টি স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের দেশে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

— জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিবেশ সংরক্ষিত হয়।

— জনশিক্ষার (Mass education) ভিত্তি সর্বস্তরে প্রসারিত করা দরকার।

— স্বাস্থ্য চেতনার বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি।

— দেশে নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো দরকার। এর ফলে তাদের অরণ্য নির্ভরতা কমবে। তাদের অরণ্য সংরক্ষণের তাগিদ বৃদ্ধি পাবে, আসামের মানস অরণ্যে এই পরীক্ষা, অর্থাৎ বন ধ্বংসকারীদের বন সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত করার পরীক্ষা যথেষ্ট সফল হয়েছে।

— পরিবেশ শিক্ষার পাশাপাশি জীবনশৈলীর শিক্ষার (Life style education) একদিকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে, অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে।

— স্থিতিশীল বিকাশ (Sustainable development) অর্থাৎ যে ধরনের অর্থনৈতিক, নাগরিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিকাশ পরিবেশ সহায়ক নীতিতে পরিচালিত হয়ে, মানুষ ও সভ্যতার অস্তিত্বকে স্থিতিশীল করে তুলবে, জীব পরিমণ্ডলের ও ভৌত পরিমণ্ডলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই ধরনের বিকাশ সম্বন্ধে নতুনভাবে নীতি প্রণয়ন করে জনসংখ্যা ও বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

সবশেষে, মনে রাখতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিন্ত না করলে, কোন নীতিই শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না।

7.4 পরিবেশ ও মানুষ (Environment and Man)

মানুষের জন্ম, বেঁচে থাকা এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের অস্তিত্ব পরিবেশ নির্ভর সে কথা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কি, সেই বিষয়টি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। কারণ তা না হলে মানুষের অস্তিত্ব কতটা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, তার গভীরতা অনুধাবন করা কঠিন। দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সম্পর্ক বিচার করা যেতে পারে— একটি ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী ও অপরটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

7.4.1 ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী (Ecological Perspective)

পূর্ববর্তী এককে ইকোলজি এবং ইকোতন্ত্রের (Ecosystem) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যার মূল কথা, চারপাশের জগতে যে সমস্ত জৈব ও অজৈব উপাদানগুলি আছে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, আদানপ্রদান ও নির্ভরশীলতার স্বরূপই ইকোতন্ত্র। ইকোতন্ত্রের প্রধান দুটি অংশ—জৈবিক (Biotic) এবং অজৈবিক (Abiotic)। কোন একটি বিশেষ দেশ এবং কালে জৈবিক ইকোতন্ত্র এবং অজৈবিক ইকোতন্ত্র পরস্পর যেভাবে সম্পর্কিত, তা একটি গতিশীল (dynamic) অবস্থা। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। ইকোতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

ইকোতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ecosystem)

—ইকোতন্ত্র ধারাবাহিক ও জটিল কিন্তু তাকে বিচার করা হয়, খণ্ডিত অবস্থায় কোন বিশেষ সময় বা অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে।

— কোন বিশেষ সময়ে এবং অঞ্চলে সমস্ত জৈবিক ও ভৌত উপাদানগুলি ইকোতন্ত্রের অংশীভূত।

— উপাদানগুলির সম্পর্ক একমুখী সরলরৈখিক (Linear) নয়, জটিল ও বহুমুখী।

— ইকোতন্ত্র একটি মুক্ত তন্ত্র (Open system)। যে কোন সময়ে নতুন উপাদানের সংযোগ বা বিলুপ্তি ঘটতে পারে। যেমন, কোন বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণি লোপ পেলে, ইকোতন্ত্রের পরিবর্তন হয়।

— প্রাকৃতিক ইকোতন্ত্র ছাড়াও কৃত্রিম ইকোতন্ত্র (Artifical) মানুষ সৃষ্টি করে। নগরায়ণ, কৃষি ব্যবস্থা, বাঁধ তৈরি, নতুন রাস্তা— কল কারখানা তৈরির ফলে কৃত্রিম ইকোতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

— ইকোতন্ত্রের নানা প্রকার ভেদ আছে। পরিবেশ শিক্ষার জন্য তার সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৃহত্তর ইকোতন্ত্র (Macro-ecosystem) এবং ক্ষুদ্রতর ইকোতন্ত্র (Micro-ecosystem) এই দুই প্রকার ইকোতন্ত্রের ভিত্তিতে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক বিচার করা হয়।

বৃহত্তর ইকোতন্ত্র (Macro-ecosystem)

ইকোতন্ত্রের অন্যতম বিষয়, এর উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের শৃঙ্খল। যেমন, খাদ্য শৃঙ্খল, নাইট্রোজেন শৃঙ্খল, ইত্যাদি। জৈবিক ইকোতন্ত্রে তিন প্রকার ভূমিকা শৃঙ্খলের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

— **উৎপাদক (Producer)** অর্থাৎ যে সমস্ত জীব নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে পারে। জীব জগতে প্রধানত উদ্ভিদেরই উৎপাদকের ভূমিকা আছে। তারা জৈব ও অজৈব উপাদানের রূপান্তর ঘটিয়ে, সূর্যালোকের সাহায্যে নিজের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার উৎপাদন করে নেয়।

— **ভোক্তা (Consumer)** অর্থাৎ যে সব প্রাণী নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। উদ্ভিদ ভোজী প্রাণিরা উদ্ভিদ থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ তৈরি করে নেয়। মাংসাশী প্রাণিরা উদ্ভিদভোজী প্রাণির উপর নির্ভর করে। মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণি দুই-ই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ ও উদ্ভিদ এই দুই প্রান্তিক উপাদানের মধ্যবর্তী স্তরে অসংখ্য ছোট ছোট খাদ্য শৃঙ্খল আছে, যে শৃঙ্খলগুলি আবার সামগ্রিকভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

— **পচন কারক (Decomposer)** অর্থাৎ যে সমস্ত জীবাণু, কীট ও অন্যান্য প্রাণি, মৃত বস্তু ও জৈবিক বর্জ্যকে ভেঙ্গে সরলতম প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে ফিরিয়ে দেয়। বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের এটাই মূল কথা, যা নিচের চিত্রটিতে সাংকেতিক ভাবে দেখানো হল।

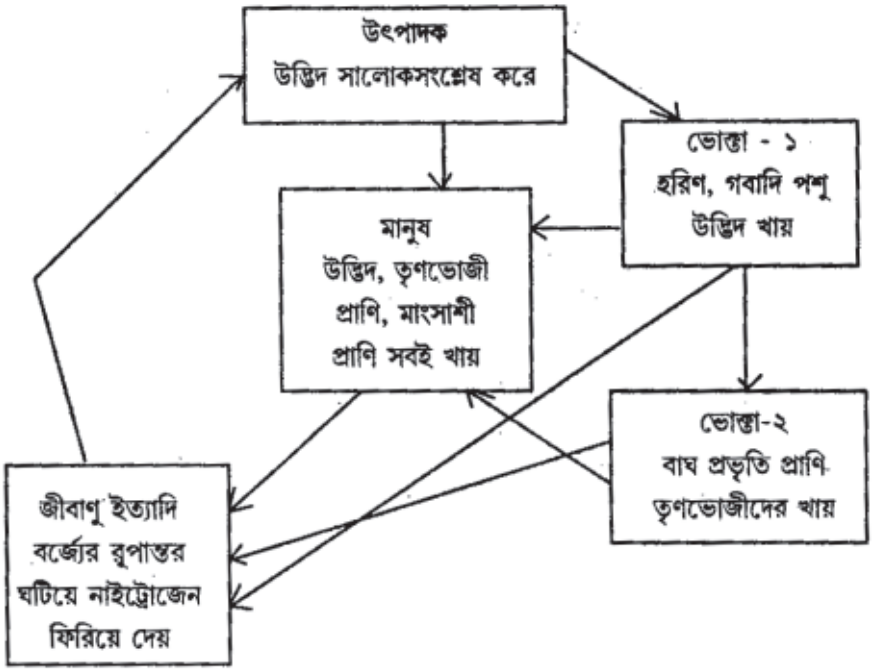

চিত্র : বৃহত্তর ইকোতন্ত্র

মনে রাখতে হবে উপরোক্ত বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের মধ্যে সমস্ত রকম অজৈব উপাদানের কথা বলা হয়নি। উৎপাদকের প্রকৃতি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, ভূপ্রকৃতি, দূষণের পরিমাণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে হিসাবে উল্লিখিত চিত্রটি বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের একটি সরলরূপ মাত্র।

ক্ষুদ্রতর ইকোতন্ত্র (Micro-ecosystem)

পরিবেশের এক একটি অংশ স্বতন্ত্র ইকোতন্ত্রের সৃষ্টি করে। এর প্রধান বিভাগগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

(ক) জল সম্পর্কিত ইকোতন্ত্র (Aquatic ecosystem)
  (১) মিষ্টি জল সম্পর্কিত (Fresh water ecosystem)
  (২) সমুদ্রজল সম্পর্কিত (Marine acquatic ecosystem)

(খ) ভূতল সম্পর্কিত ইকোতন্ত্র (Terrestrial ecosystem)
  (১) মরুভূমি (২) তৃণভূমি
  (৩) অরণ্যভূমি (৪) তুন্দ্রা অঞ্চল, ইত্যাদি।

ইকোতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনেকটা পিরামিডের মত, যার শীর্ষে আছে মানুষ এবং ভিত্তিতে আছে উদ্ভিদ ও ভূপ্রকৃতি। সেজন্য মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেকে বাদ দিয়ে শুধু প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করেছে। পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো। অর্থাৎ শীর্ষে অবস্থান করলেও, যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তার শীর্ষে অবস্থান তার অবহেলা অস্তিত্বের সংকট ডেকে নিয়ে আসছে এই কথাটি বোঝা এবং তদনুযায়ী প্রতিকার করা।

7.4.2 মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (Psychological Perspective)

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বোঝানো হয় কয়েকটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের মাধ্যমে, যার কেন্দ্রে আছে মানুষ নিজেই। আমাদের পরিবেশ কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক প্রভাব আলাদা। সুতরাং মানবিক ইকোলজি (Human ecology) এমন একটি আন্তঃ সম্পর্কের জাল যা মানুষের আচরণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (Human ecology is such a web of interrelations that influences directly and indirectly human behaviour and in itself is influenced by human behaviour)

Kurt Lewin প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের পরিবেশকে একটি ক্ষেত্র (Field) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষেত্র তত্ত্বের (Field theory) ভিত্তি উপরোক্ত মানবিক ইকোলজি। নিচের চিত্রটিতে বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

মানবিক ইকোলজির নমুনা চিত্র

চিত্রটিতে পরিবেশের স্তরবিন্যাস দেখানো হয়েছে যার কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি।

ব্যক্তি (Individual) — প্রত্যেক মানুষই জন্মের সময় কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় যার কিছুটা জাতিগত (Phylogenetic) অর্থাৎ সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই যা সাধারণ। যেমন, শরীর সংস্থান, শরীর বৃত্তীয় সক্রিয়তা, ইত্যাদি সকলের বেলাতেই একইরকম। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Ontogenetic) অর্থাৎ যা কোন একক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন, বুদ্ধি, গায়ের রঙ ইত্যাদি যা কিছু জিনের মাধ্যমে পিতামাতার বিশেষত্ব অনুযায়ী পাওয়া গেছে। পরিবেশের সঙ্গে প্রাথমিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এগুলিই প্রধান ভিত্তি।

● উপস্থিত ভৌত ও জৈব পরিমণ্ডল এবং পরিবার (Immediate Physical and Biological Surrounding and Family)

উপস্থিত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে যে এগুলি নবজাতকের ইন্দ্রিয় গোচর। সে যা দেখতে পায়, শুনতে পায়,

যে তাপ বা শৈত্য অনুভব করে, এবং সেই সঙ্গে যে পারিবারিক বৃত্তে এবং সাহচর্যে তার জীবন শুরু হয়। পরিবারকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে কারণ পরিবারও একই জৈব ও ভৌত পরিমণ্ডলে বাস করে। এই পরিবেশ থেকেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপাদানগুলি আসে।

● **জীবন ধারণের জৈব ও অজৈব উপাদান এবং পরিবারের বাইরের সমাজ (Biological and Physical Factors of living and Society outside Family)** এখানে বলা হয়েছে, যা কিছু উপাদান জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন, তার সবটাই প্রত্যক্ষ গোচর নয় কিন্তু তাদের প্রভাবে জীবন ধারণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে জীবন ধারণ-এর অর্থ শুধু বেঁচে থাকা নয়, জীবন যাপনের এবং জীবন যাপনের গুণমানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু। সেই সঙ্গে পরিবার ও পরিবরের বাইরের মানুষজনও একই উপাদানের সাহায্যে জীবন ধারণ করে কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে যার অনেকটাই পরিবারের মাধ্যমে পরিশ্রুত হয়ে আসে।

● **বৃহত্তর জৈব ও অজৈব পরিমণ্ডল এবং সামাজিক উপাদান সমূহ (Greater Biological and Physical Environment and Social Factors)** —বৃহত্তর জৈব ও অজৈব পরিমণ্ডলকে এক কথায় বলা যায় বৃহত্তর ইকোতন্ত্র (Macro ecosystem)। যে পরিমণ্ডল সামগ্রিকভাবে কোন ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই-ই হল বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার প্রভাব ক্রমশ ব্যক্তির উপরই কার্যকর হয়। সামাজিক উপাদান কথাটির অর্থ যা কিছু সামাজিক বিষয় আমাদের সমাজায়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, প্রথা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি যা কিছু মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়, তাকেই বলা হয়েছে সামাজিক উপাদান সমূহ। শিক্ষা, কৃষ্টি ইত্যাদিও এর অন্তর্গত।

● **প্রান্তিক পরিমণ্ডল (Peripheral Surrounding)** — আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক সহজে বোঝা যায় না কিন্তু নানাভাবে ব্যক্তিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক বিষয়, মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপ অথবা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি এরকম বিষয়গুলিও খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray) মানুষের অজ্ঞাতে তার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে, তখনই যখন ওজোন স্তরে তা শোষিত হয় না। শোষিত না হওয়ার কারণ গ্রিনহাউস প্রভাব (বৃহত্তর জৈব ও অজৈব পরিমণ্ডল)। পর্যায়ক্রমে পরবর্তী স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে তার প্রভাব ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়।

বলা বাহুল্য প্রতিটি স্তরেই জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে সামাজিক আচরণের সম্পর্ক আছে। সে জন্য প্রত্যেকটি স্তরকেই দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের উপরোক্ত সম্পর্ক প্রকৃত সম্পর্কের একটি সরল রূপ মাত্র যা থেকে আমরা একটা প্রাথমিক ধারণা পাই। প্রকৃত সম্পর্ক আরও জটিল ও বহুমাত্রিক।

7.5 সার সংক্ষেপ (Summary)

নানা কারণে পরিবেশের জন্য উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বিজ্ঞানী ও বহু সাধারণ মানুষের মনেও তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রধান তিনটি কারণের মধ্যে প্রথমটি পরিবেশ দূষণ। যখন পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে এমন ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ঐ উপাদানের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে বলা হয় দূষণ। দূষণকে নানাভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রাথমিক ও গৌণ দূষণ, অথবা গুণগত ও পরিমাণগত দূষণ হয়ে থাকে। কিন্তু

সবচেয়ে বেশি প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ হল, ইকোতন্ত্রের পরিবর্তন যা জৈব পরিবর্তনশীল ও জৈব পরিবর্তনরহিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে বায়ু, ভূমি, জল, এই সবই দূষিত হয়ে থাকে। যানবাহন, কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া, কৃষিকাজের দরুন মিথেনের সৃষ্টি, ভাসমান বস্তু কণা ইত্যাদির দরুন বায়ু দূষিত হয়। মাটির সঙ্গে নানা অজৈব বস্তু মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকা দূষণ হয়। জল দূষণের কারণ কলকারখানার ও গৃহস্থালীর বর্জ্য, কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। এছাড়াও নাগরিক জীবনে আছে শব্দ দূষণের অভিশাপ।

পরিবেশের জন্য উদ্বেগের দ্বিতীয় কারণ, সম্পদের অবক্ষয়।। ক্রমাগত ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে সঞ্চিত সম্পদ ক্রমশ কমে আসছে। যে সম্পদ অপূরণযোগ্য তার অনেকটাই নিঃশেষিত হওয়ার মুখে, যেমন খনিজ সম্পদ। আর পূরণযোগ্য সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার চেয়ে ব্যবহারের পরিমাণ বেশি হতে থাকায় তার পরিপূরণ ঘটে না। মানব সভ্যতা শক্তি নির্ভর। শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস জ্বালানি। খনিজ জ্বালানি প্রায় নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম। শক্তির সংরক্ষণ, বিকল্প শক্তি, অপ্রচলিত শক্তি প্রভৃতির সাহায্যে শক্তির প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা চলেছে। অন্যান্য সম্পদের মধ্যে ভূমি সম্পদ, জল সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, অরণ্য সম্পদ ও খনিজ সম্পদ সব কিছুরই ক্রমাগত অবক্ষয় ঘটছে। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা অবক্ষয়ের কারণগুলি চিহ্নিত করে সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হয়েছেন। কিন্তু সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়া এই প্রয়াস সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পরিবেশের জন্য উদ্বেগের তৃতীয় কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের অবনতি ও অবক্ষয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সেজন্য, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া দরকার।

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সহজেই বোঝা যায়। দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমটি ইকোতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী। ইকোতন্ত্রকে অনেকরকম ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। কিন্তু এখানে পরিবেশের মধ্যে মানুষের অবস্থান শীর্ষে বলে মনে করা হয়। পরিবেশের অন্যান্য উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে অবস্থান করে, যার ভিত্তি হল উদ্ভিদ ও ভূপ্রকৃতি। অপর দৃষ্টিভঙ্গীটি মনঃস্তাত্ত্বিক। এতে মানুষের অবস্থান পরিবেশের কেন্দ্রে। তার চারপাশে প্রত্যক্ষগোচর জৈব, ভৌত ও সামাজিক পরিমণ্ডল। সবচেয়ে শেষ স্তরে আছে প্রান্তিক পরিমণ্ডল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক, মহাজাগতিক এই জাতীয় প্রভাব। প্রতিটি স্তরের প্রভাব শেষপর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্তরগুলির মাধ্যমে মানুষে সঞ্চারিত হয়।

7.6 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) পরিবেশের জন্য উদ্বেগ কথাটির অর্থ কি?

(খ) দূষণ কাকে বলে?

(গ) বায়ু দূষণের একটি কারণ লিখুন।

(ঘ) কৃষির দরুন কিভাবে বায়ু দূষণ হতে পারে?

(ঙ) সম্পদ কাকে বলে?

(চ) শক্তিকে সম্পদ বলা হয় কেন?

(ছ) জল সম্পদের অবক্ষয় কেন হয় তার একটি কারণ লিখুন।

(জ) অরণ্য সম্পদ ধ্বংসের একটি কারণ লিখুন।

(ঝ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্পর্ক কি?

(ঞ) মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক কোন্ দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা হয়?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) বায়ু দূষণের কারণগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) মৃত্তিকা দূষণ কিভাবে হয়?

(গ) জল দূষণের প্রতিকার কি?

(ঘ) অপ্রচলিত শক্তি কি? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঙ) সামুদ্রিক সম্পদ কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

(চ) খনিজসম্পদের বর্তমান পরিস্থিতি কি?

(ছ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অরণ্য ধ্বংসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(জ) ইকোলজি কাকে বলে ও কয় প্রকার?

(ঝ) ব্যক্তির সঙ্গে তার উপস্থিত ভৌত ও জৈব পরিমণ্ডলের এবং পরিবারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(ঞ) ইকোতন্ত্রে পিরামিড আকৃতির মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) পরিবেশ দূষণ কাকে বলে? পরিবেশ দূষণের প্রকৃতি ও কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সম্পদের অবক্ষয় কথাটির অর্থ কি? জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদের অবক্ষয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(গ) শক্তি কত প্রকার? পরিবেশের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক কি? শক্তির অবক্ষয় ও তার প্রতিকার আলোচনা করুন।

(ঘ) মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ে একটি রচনা লিখুন।

(ঙ) "জনসংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ" —কেন তা ব্যাখ্যা করুন। উদাহরণ দিন। প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে মতামত দিন।

একক 8 □ পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা সমূহ (Agencies of Environmental Education)

গঠন

8.1 সূচনা

8.2 উদ্দেশ্য

8.3 পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা

- 8.3.1 প্রথাগত সংস্থা
- 8.3.2 প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার স্তর
- 8.3.3 প্রথা বহির্ভূত সংস্থা

8.4 সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

- 8.4.1 সরকারি সংস্থা
- 8.4.2 বেসরকারি সংস্থা

8.5 গণমাধ্যম

- 8.5.1 সংবাদপত্র
- 8.5.2 রেডিও
- 8.5.3 ইলেকট্রনিক মাধ্যম
- 8.5.4 অন্যান্য মাধ্যম

8.6 সারসংক্ষেপ

8.7 প্রশ্নাবলি

8.1 সূচনা (Introduction)

পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী দুটি এককের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে প্রথম এককে বিশেষভাবে বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে বিদ্যালয়ই পরিবেশ শিক্ষার একমাত্র ক্ষেত্র বা সংস্থা। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরেও বিপুল সংখ্যক মানুষ আছেন যাদেরও পরিবেশ শিক্ষার বাইরে রাখা চলবে না। বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছেন। আমাদের মত দেশে এর একটা বড় অংশ কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। আর একটা অংশ স্কুলে পড়া শুরু করেও, নানা স্তরে স্কুল ছুট (Dropout) হয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে শিশু শ্রমিকরাও। শিশুশ্রম বিরোধী আইন পাশ হলেও এখনও বিপুল সংখ্যক শিশু অর্থের বিনিময়ে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়, পরিবারেও অর্থ-সাহায্য করে।

অন্যদিকে পরিণত বয়স্ক জনগণের একটা বড় অংশ যারা খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি এবং যারা শিক্ষিত হলেও কোনও রকম পরিবেশ শিক্ষা ছাড়াই নিজেদের প্রথাগত বিদ্যাচর্চা শেষ করেছে। তাদের জন্যও পরিবেশ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সুতরাং সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিদ্যালয়ই পরিবেশ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নয়। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতিও আলাদা। বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয় পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা ও তাদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ধারণা। সেই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

8.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা কথাটির অর্থ বলতে পারবেন।
- প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরকারি সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

8.3 পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Environmental Education)

'পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা' কথাটি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান (Institution) কথাটির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সেজন্য 'সংস্থা' এই নামপদটি যথোপযুক্ত মনে হয়।

যে প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংঘবদ্ধ প্রয়াস অথবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যমুখী প্রচেষ্টা সচেতনভাবে কোনও না কোনও ভাবে জন সাধারণকে পরিবেশ সচেতন করে তোলে ও পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সাহায্য করে তাকেই পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা বলা হয়। (The institute, Organisation, organised effort or similar other goal oriented effort consciously makes people aware of environment and helps in acquiring knowledge, about environment, is called an agency of Environment education)।

এই সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় পরিবেশ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও একধরনের পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা। অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও সংস্থা আছে। পরিবেশ শিক্ষার সংস্থাগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়— প্রথাগত সংস্থা (Formal agencies) এবং প্রথা বহির্ভূত সংস্থা (Non formal agencies) সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার প্রকার ভেদ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে করা হয়, পরিবেশ শিক্ষার বেলাতেও অনেকটা সেই ধরনের। উভয়প্রকার সংস্থা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

8.3.1 প্রথাগত সংস্থা (Formal Agencies)

সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই প্রথাগত শিক্ষা। প্রথাগত সাধারণ শিক্ষার মতই প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থার কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

● প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষা কোন একটি কেন্দ্রে বা শাখা কেন্দ্রে পরিচালিত হয়। যেমন, বিদ্যালয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

● প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে। সাধারণ শিক্ষার মতই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার মান ক্রমশ উন্নত হতে থাকে।

● প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা, যেমন, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি, বিশেষ প্রশাসনিক নীতি ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

● প্রত্যেকটি স্তরের জন্য সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষার আলাদা পাঠক্রম আছে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হয়।

● প্রথাগত শিক্ষার শেষে মূল্যায়ন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও বিশেষ প্রথামত সম্পন্ন হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না।

● পরিবেশ শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষার মতই এক বা একাধিক শিক্ষকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব পদ্ধতিতে পাঠক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তিনিই পরিচালনা করেন।

● প্রথাগত শিক্ষার প্রকরণও পূর্বনির্ধারিত এবং একই প্রকরণ বারংবার ব্যবহৃত হতে পারে।

● প্রথাগত শিক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর একযোগে উপস্থিত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই সংস্থার নিয়ম কানুন, রীতিনীতি, নির্দেশ মেনে চলতে হয় এবং শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

এই সব কারণে প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার কয়েকটি সুবিধা আছে।

● যেহেতু প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান থাকে না, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিবেশ শিক্ষা পরিচালিত হয়। অতএব প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত সাধারণ শিক্ষার সবকয়টি সুবিধাই পাওয়া যায়।

● প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষায় একযোগে বহু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে। অনেক কম সময়ে বহু শিক্ষার্থী পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে।

● এর ফলে ব্যয় কম হয়। পরিবেশ শিক্ষার জন্য আলাদা কোন খরচ দরকার হয় না।

● স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয় না।

● শিক্ষার্থীদের উপর চাপ কম পড়ে।

● প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় এরকম উপকরণগুলি পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।

● দক্ষ শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

● নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা শেষ হয় এবং তার ফলাফল যাচাই করা যায়।

● শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসক প্রত্যেকেই দায়িত্ব নিয়ে যার যার কাজ করে যান। এর ফলে পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতার সম্ভাবনা বাড়ে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথাগত পরিবশে শিক্ষার কিছু কিছু সমস্যা আছে।

● প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা গৌণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হলে, তা যথেষ্ট গুরুত্ব নাও পেতে পারে।

- প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা কিছুটা গতানুগতিক, যান্ত্রিক নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হতে পারে।
- পরিবেশ শিক্ষাও পরীক্ষা সর্বস্ব হয়ে উঠতে পারে!
- শিক্ষকরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পেলে, পরিবেশ শিক্ষার মান আশানুরূপ না হতে পারে।
- সমস্ত শিক্ষক, প্রশাসক ও অভিভাবক যদি সচেতন না হন, তবে পরিবেশ শিক্ষা তাদের কাছে বোঝা স্বরূপ মনে হতে পারে।
- শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে বসে শিক্ষকের মুখ থেকে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তারজন্য যে সক্রিয়তা ও পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ দরকার তার অভাব ঘটলে পরিবেশ শিক্ষার আর কোন সার্থকতা থাকে না।

কিন্তু এই সব সমস্যা থাকলেও প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকাব করা যায় না। মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক স্তরে যত আলোচনা হয়েছে বা উদ্যম নেওয়া হয়েছে, তার প্রধান লক্ষ্যই বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে।

8.3.2 প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার স্তর (Levels of Formal Environmental Education)

প্রাথমিক স্তর (Primary Level) : পরিবেশ শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া উচিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুদের সার্বিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি করা। অর্থাৎ তাদের দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশের জন্য প্রথম বাল্যকালের (Early Childhood) স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলি সঠিকভাবে যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করা। সক্রিয়তা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। যে সমস্ত সঞ্চালনমূলক, প্রজ্ঞামূলক ও সামাজিক দক্ষতা (Skill) পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ সেগুলি আয়ত্ত করে প্রাথমিক স্তরে। পড়া, লেখা, গণিতের চারটি মৌলিক প্রক্রিয়া (Fundamental operations) এই পর্যায়েই শেখা হয়। সেই সঙ্গে আত্ম নির্ভরতার শিক্ষাও প্রাথমিক স্তরে শুরু হয়। মাতৃভাষা, প্রকৃতি পরিচয়, স্বাস্থ্যবিধি, গণিতের প্রাথমিক শিক্ষা এবং সমাজ পরিচিতি, মূলত এই পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। যদিও আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার দরুন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শেখানো বাধ্যতামূলক, কিন্তু তার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের বিশেষ সম্পর্ক নেই। যাইহোক, প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয়, সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার ভিতরেই প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে।

যে সমস্ত প্রসঙ্গ প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা ও কাজে লাগানো দরকার, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

- পরিবেশ কথাটির সঙ্গে পরিচিতি প্রাথমিক স্তরে হওয়া দরকার। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের পঠন পাঠন ও সক্রিয়তার ক্ষেত্রে পরিবেশ শব্দটির ব্যবহার ও তার প্রাথমিক ধারণা তৈরি হওয়া দরকার।
- চারপাশের প্রাণি ও উদ্ভিদ, অর্থাৎ গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল, ফুল-ফলের গাছ, কৃষিক্ষেত্রের গাছ, গৃহপালিত পশু, কীট পতঙ্গ, যা কিছু তার প্রত্যক্ষগোচর সেগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল ও প্রাথমিক ধারণা জন্মানো দরকার।
- পর্যবেক্ষণে উৎসাহ দিলে, শিশুদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতে তা প্রকৃতি প্রেমে পরিণত হতে পারে।
- চারপাশের মানুষ, বিভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তি, তাদের কাজকর্ম, জীবন চর্চা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করা প্রাথমিক স্তরেই সম্ভব।

- স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ রোগ ব্যধির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা, পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতনতা, এগুলি সবই পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। এইগুলির প্রাথমিক শিক্ষাও ভবিষ্যত পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

- খেলাধূলা, শরীর চর্চার সম্বন্ধে শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। সুতরাং খেলাধূলার সময় পরিবেশের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক শিশুদের বোধগম্য ভাষায় তুলা ধরা দরকার।

- গ্রামাঞ্চলে মধ্যাহ্নকালীন আহারের জন্য খাদ্য রান্না করা, পরিবেশন, পরিচ্ছন্নতা এই সবই পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

এককথায় প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ করা দরকার কারণ এই ভিত্তি যে দৃঢ় বুনিয়াদ তৈরি করে, তা সারা জীবন স্থায়ী হয়। আমরা অনেক শিক্ষাই ভুলে যাই কিন্তু প্রাথমিক স্তরে শেখা বিষয়, যেমন, লেখা, পড়া, অঙ্কের সাধারণ নিয়ম এসব আমরা কোনদিনও ভুলি না। এমন কি প্রাথমিক স্তরে শেখা ছড়া, কবিতা অনেকেরই সারাজীবন মনে থাকে।

মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage) — মাধ্যমিক স্তরে প্রাথমিক স্তরে শুরু হওয়া পরিবেশ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দরকার। মাধ্যমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে সক্রিয়তা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদির গুরুত্ব যথেষ্ট থাকলেও লেখা পড়া অনেকটা বিষয় নির্ভর হয়ে ওঠে। মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান এই সব বিষয় সমগ্র মাধ্যমিক স্তরেই পড়ানো হয়। এই সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বাইরে যে সব পরোক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব দেখে বা স্পর্শ করে বোঝা যায় না, উদ্ভিদের পাতায় প্রস্বেদন ঘটে তা সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে তথ্য সংগ্রহের, তথ্য বিশ্লেষণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, ইন্দ্রিয় পরীক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে নানাভাবে সম্ভব। জ্ঞান একমুখী বা একমাত্রিক নয়, এখন জ্ঞান বহুমুখী ও বহু মাত্রিক।

পরিবেশের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্তরে যে পরিবেশ ছিল প্রত্যক্ষগোচর মাধ্যমিক স্তরে সেই পরিবেশই দেখা দেয় বহু রূপে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরেই প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার শুরু। আরও একটি কারণে মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। এই স্তরের শিক্ষার কাঠামো প্রায় সর্বজনীন। বিষয়বস্তু, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপাদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিছু কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও, মূলত তা সর্বত্র একই। এই কারণে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মৌলিক ধারণাগুলি শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষাদানের অন্যান্য সুবিধাগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

- কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক কৌতূহল, উদ্যম, উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সহজেই তাদের পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশকর্মী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

- মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার উপাদানগুলি যুক্ত করা সম্ভব। এর ফলে তাদের পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করা যেমন সহজ হবে তেমনি অনায়াসে পরিবেশ সম্বন্ধেও শিক্ষা লাভ হবে।

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতানুগতিক সহপাঠক্রমিক কাজগুলির পরিবর্তে পরিবেশ সম্পর্কিত সহপাঠক্রমিক কাজের প্রবর্তন করলে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

- বিমূর্ত চিন্তায় সক্ষম মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তাদের চারপাশের পরিবেশকে বুঝতে চেষ্টা করবে, এর ফলে শুধুমাত্র তথ্য নয় পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক তারা অনুধাবন করতে পারবে এবং নিজেদের আচরণ সেই মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

● তারা অন্যদের স্বমতে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে পারবে এবং নিজের শিক্ষা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের ক্ষেত্রে আর একটি সুবিধা এই যে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রবণতা বেশি, দলের প্রতি আনুগত্য (Group conformity) এই সময়ে সর্বাধিক। সেজন্য দলগত দায়িত্ব দিলে এরা অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে থাকেন। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদ্ধতি হল দলবদ্ধভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ। সেদিক থেকেও মাধ্যমিক স্তরের উপযোগিতা সর্বাধিক।

মাধ্যমিক স্তরে বা পরবর্তী স্তরে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে পরবর্তী একটি এককে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এখানে মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার সমস্যা (Problems of Environmental Education in Secondary Stage)

মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি অনতিক্রম্য নয়। তবে তার জন্য সমস্যাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

● মাধ্যমিক স্তর বিশেষভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরকে সাধারণত উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশ পথ বলে মনে করা হয়। এই স্তরে উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সর্বাধিক। সেজন্য, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক সকলেই পাঠক্রমের সেই অংশগুলির উপর জোর দিয়ে থাকেন যা তাঁর পরবর্তী শিক্ষার পথ সুগম করবে বলে মনে করেন। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষা তাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব না পেতে পারে।

● মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন পাঠক্রম (Core Curriculum) অনুযায়ী পাঠ পরিচালিত হয় কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি স্বতন্ত্র শাখায় ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষা যদি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্য না হয় অর্থাৎ যদি পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু পাঠক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হয় তবে একই স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় আলাদা হতে পারে।

● মাধ্যমিক স্তর পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কিন্তু গ্রাম, শহর, মহানগর প্রভৃতি বাসস্থান এলাকাগুলির পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ভিন্ন রকম হওয়ায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীর একই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয়। ফলে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পরিবেশ শিক্ষার একটি অভিন্ন পাঠক্রম নির্বাচন করা কঠিন।

● অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা মাধ্যমিক স্তরে কার্যকর পরিবেশ শিক্ষাদানের একটি প্রধান অন্তরায়।

● যথাযথ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ছাড়া এই জাতীয় পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং গুণগত মান এখনও যথেষ্ট উন্নত নয়। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি যুক্ত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর (College and University Stage)

নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে সম্প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়ানো শুরু হয়েছে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণও বাধ্যতামূলক হয়েছে। সেইরকম কলেজ স্তরেও পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত শাখাতেই পাঠ্য হিসাবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় অথবা বলা যায় কিছুটা অবহেলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শুধুমাত্র পরিবেশ বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগগুলিতে পরিবেশ শিক্ষার কোন আয়োজন নেই।

পরিবেশ শিক্ষার প্রথাগত সংস্থা হিসাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রধান কার্যক্রম হওয়া উচিত পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার গবেষণায় জোর দেওয়া। সেজন্য কলেজ স্তরে পরিবেশ ও তার সমস্যার সঠিক চরিত্র অনুধাবন করার প্রসঙ্গটিতে জোর দেওয়া এবং সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করার পূর্বে এই স্তরে যে সমস্ত বিদ্যাচর্চার শাখা পরিবেশ সংক্রান্ত পাঠ ও গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেগুলি উল্লেখ করা দরকার।

ভাষা ও সাহিত্য (Language and Literature) — সমস্ত সাহিত্যেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ক বহু উচ্চাঙ্গ রচনা আছে। ঐগুলির মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক সান্নিধ্য তৈরি হতে পারে।

রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা (Physics and Chemistry)—পরিবেশের ভৌত উপাদানগুলি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের জীবনযাত্রা ও আচরণের সঙ্গে ভৌত উপাদানগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এই সব বিষয় চর্চা করার সর্বোত্তম মাধ্যম রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। বিশেষভাবে জৈব রসায়ন (Organic Chemistry), পদার্থবিদ্যার তাপ (Heat), আলোক (Light), শব্দ (Sound) ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যা উল্লেখযোগ্য।

জীব বিদ্যা (Biology) — প্রাণিবিদ্যা (Zoology), উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany), শরীরবৃত্তীয় বিদ্যা (Physiology) বা তাদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা পরিবেশ বিদ্যার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এইগুলির মাধ্যমেও পরিবেশের জৈবিক উপাদান সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ চর্চা হওয়া দরকার।

সমাজ বিদ্যা (Social Sciences) — সমাজবিদ্যাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)। পরিবেশের সমস্ত উপাদান, তাদের পরিবর্তন, ব্যবহার, ইত্যাদি শেষপর্যন্ত মানুষের আচরণের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত। পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের আচরণে পরিবেশবান্ধব বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা। সমাজবিজ্ঞানও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার, তাদের বিবর্তন, উৎস ও প্রভাব এমনি অসংখ্য বিষয় পরিবেশ ও তার সংরক্ষণের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে সক্ষম। নৃতত্ত্ব বিদ্যাও (Anthropology) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূবিদ্যা (Earth Sciences)—ভূগোল (Geography) ও ভূ-বিজ্ঞান (Geology) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আঞ্চলিক ভূগোল থেকে শুরু করে আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমির প্রকৃতি, ভূস্তরের উপাদান, ক্ষয়, খনিজ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। মানচিত্রবিদ্যা (Cartography) পরিবেশ চর্চার আর একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার।

ইতিহাস (History) ও পুরাতত্ত্ব (Archeology)— ইতিহাস অতীত সভ্যতার উত্থান পতন ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ যে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্বন্ধে তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রধান উৎস। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব থেকে বর্তমান মানুষ তার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত পেতে পারে এবং সে হিসাবে পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রে পরোক্ষ হলেও ইতিহাসের ভূমিকা নগণ্য নয়।

অন্যান্য বিদ্যা (Other disciplines)— এছাড়াও গণিত, জৈব প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমুদ্রবিদ্যা, ইত্যাদি এমন কোন বিষয় নেই যা কোনও না কোন ভাবে পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে না পারে।

পেশাবিষয়ক বিদ্যা (Professional Disciplines)—উচ্চতর শিক্ষার একটি বড় অংশ পেশাবিষয়ক বিদ্যাচর্চা করে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Sciences)। চিকিৎসা বিদ্যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শরীর ও মনের ক্রিয়াকলাপ, রোগ-ব্যাধি, তাদের কারণ ও নিরাময় নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছে। একজন চিকিৎসকের অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয় কোন্ শারীরিক বিপর্যয় কোন্ পরিবেশে

কিভাবে ঘটে, কেন ঘটে। সুতরাং একজন চিকিৎসকের পক্ষে যেমন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমনি-চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিবেশ শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে চলেছে। প্রযুক্তির (Technology) নানা শাখাতেও পরিবেশ চর্চা অপরিহার্য। বস্তুতঃ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশ বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান গবেষণার বিষয় (যেমন, রেফ্রিজারেটার, অটোমোবাইল প্রভৃতি প্রযুক্তির পরিবর্তন)। এই প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা বিদ্যার (Management Science) কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এই সব বিষয়ের বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তরে যে ভিত্তি তৈরি হয় তাকে প্রকৃত ফলপ্রসূ করার স্থান উচ্চতর শিক্ষা।

8.3.3 প্রথা বহির্ভূত সংস্থা (Nonformal Agencies)

প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে আছে বৃহত্তর ও বিপুল সংখ্যক জনতা যাদের ক্ষেত্রেও পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে আছে নানা ধরনের মানুষ। যেমন, (ক) যারা কখনও প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পায়নি, (খ) যাঁরা প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেও নানা কারণে অল্পকাল পরেই ছেড়ে দিয়েছে, (গ) যারা অনেক কাল পূর্বে শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে ইত্যাদি। পরিবেশ সংক্রান্ত কোন প্রথাগত জ্ঞান লাভ করা এদের কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এই সব মানুষকে পরিবেশ শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখলে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। এই সব মানুষের জন্য পরিবেশ শিক্ষার আয়োজক যে কোন প্রতিষ্ঠানই প্রথাবহির্ভূত সংস্থা হিসাবে গণ্য হতে পারে। এরকম সম্ভাব্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

প্রথাগত সংস্থার প্রথাবহির্ভূত ভূমিকা (Nonformal Role of Formal Agencies)—প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি তাদের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে, প্রতিষ্ঠানের বাইরের মানুষকে পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশবান্ধব আচরণে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারি সাহায্য ও অনুদান নির্ভর জাতীয় সেবা প্রকল্পের (National Service Scheme বা NSS) কথা। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকল্পের অন্তর্গত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও তার লালন পালনকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখায় সাহায্য করা। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় এই সব কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং নিয়ম রক্ষায় পর্যবসিত হয়। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করলে এই জাতীয় প্রকল্প প্রথাবহির্ভূত পরিবেশ শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও, বিদ্যালয়গুলি যে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অবস্থান, সেই অঞ্চলের মানুষকে পরিবেশ সচেতন করার দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু কিছু বিদ্যালয় এই জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেও এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ মাধ্যমটি এখও পর্যন্ত প্রায় অব্যবহৃতই থেকে গেছে।

অন্যান্য প্রথা বহির্ভূত সংস্থা (Other Nonformal Agencies)—প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কিছু কিছু প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির (Adult Education Centre) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষর করে তোলার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পারিবারিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের পরিবেশ সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। এর ফলে বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ জনতা পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। এর জন্য কোন স্বতন্ত্র পাঠক্রমের প্রয়োজন নেই। গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশ ও সমস্যাগুলির মধ্যে থেকেই পরিবেশ শিক্ষার উপাদানগুলি বেছে নেওয়া যায়।

এই ধরনের আর একটি সংস্থা হয়ে উঠতে পারে গ্রাম সভাগুলি। গ্রাম সভায় সমবেত গ্রামবাসীরাও একইভাবে নিজেদের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে উদ্যোগী হলে, এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও তথ্য পেলে পরিবেশ শিক্ষায় নিজেদের স্ব-শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন। মনে রাখতে হবে গ্রামীণ জীবন যাত্রায়, পুরনো ঐতিহ্য এবং অন্যান্য প্রথার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বহু উপাদান স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘকাল যাবৎ নিহিত আছে। সেই গুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে এবং অবাঞ্ছিত আচরণগুলি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে, পরিবেশ শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লোকশিল্প, লোক সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠান রীতি নীতির কথাও উল্লেখ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে ভাদু, টুসু, ঝুমুর ইত্যাদি উৎসব ও গান অনেক সময়ই লোক শিক্ষার উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। গ্রামীণ মেলাগুলিও এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক একটি মেলায় লক্ষাধিক পর্যন্ত জনসমাগম হওয়ায় একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করে তুলে পরিবেশ রক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা যায়।

উপরোক্ত সংস্থাগুলি উদাহরণ মাত্র। এই ধরনের আরও সংস্থা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

8.4 সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা (Role of Government and Non Government Agencies)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষার উদ্যোগ শুরু হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ মুক্তির প্রসঙ্গে নানা প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। সরকারি সংস্থা হিসাবে প্রধান কয়েকটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হল।

8.4.1 সরকারি সংস্থা (Government Agencies)

পরিবেশ দপ্তর (Department of Environment)

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করার পর কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সভায় একজন করে পরিবেশ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বলাবাহুল্য তাঁদের জন্য স্বতন্ত্রদপ্তর ও ব্যয়বরাদ্দও নির্দিষ্ট করা হয়। এই দপ্তরগুলি সর্বভারতীয় স্তরে অথবা রাজ্য স্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল,

- পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ।
- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনা গঠন।
- পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
- শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় পরিবেশ শিক্ষার বিস্তার ও স্থায়ী কার্যক্রম নির্ধারণ করা।
- প্রচার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

এর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা সরাসরি পরিবেশ শিক্ষার আয়োজনের সহায়ক। এই দিক থেকে সরকারি পরিবেশ দপ্তরকে পরিবেশ শিক্ষার প্রথা বহির্ভূত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। ব্যাপক গণ শিক্ষার আয়োজন করা ছাড়াও, পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গবেষণা, গবেষণায় উৎসাহ ও আর্থিক অনুদান, বিভিন্ন আলোচনা সভা,

প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদি আয়োজন করে সরকারি পরিবেশ দপ্তর পরিবেশ শিক্ষার গ্রহণ বহির্ভূত সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

সরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (Autonomous Bodies Receiving Govt. Grant)—জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (N.C.E.R.T.), জাতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষৎ (Indian Council for Social Science Research), জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন ও পরিকল্পনা সংস্থা (National Institute of Educational Planning and Administration) প্রভৃতি সংস্থাগুলি স্বশাসিত হলেও সম্পূর্ণভাবে সরকারি অনুদান নির্ভর। এইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সরকারি কর্মচারির প্রাপ্তব্য সমস্তরকম সুযোগ সুবিধাই পেয়ে থাকেন এবং সংস্থাগুলি মোটামুটি সরকারি নীতিতেই পরিচালিত হয়। সেজন্য এই সব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। প্রধানত স্বাধীন গবেষণা সংস্থা হওয়ায় এদের কাজ প্রধানত গবেষণা ও প্রশিক্ষণমূলক। সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এদের গবেষণালব্ধ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষার জন্য গবেষণা, গবেষণায় উৎসাহ দান, আলোচনা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষার জন্য পুস্তক প্রণয়ন, অন্যান্য উপকরণ তৈরি করা, সমীক্ষা পরিচালনা করা, আঞ্চলিক ক্ষেত্র উপদেষ্টা (Field Adviser) মারফৎ সারা দেশে বিশেষজ্ঞ পরিষেবা দান ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে N.C.E.R.T. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

8.4.2 বেসরকারি সংস্থা (Non Government Agencies)

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক নজরদারি, পরিবেশ সংক্রান্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি (N.G.O.) যতটা তৎপর, প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা ততটাই সীমিত। বিশেষভাবে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখে বিকাশ (Development) এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, তারজন্য জীবন যাত্রা প্রণালীতে কি ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, ইত্যাদি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলিতে অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা নগণ্য।

তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও অনেক সমাজসেবা মূলক বা সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান (Social Welfare Organization) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি অনেক সময়ই বছরের কয়েকটি দিন পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন, বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত প্রচার ও পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করা, তহবিল সংগ্রহ, বনমহোৎসব পালন, সাফাই অভিযান প্রভৃতি কাজের উদ্যোক্তা বিদ্যালয় ছাড়াও বহু সমিতি, ক্লাব, সমাজসেবী সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নানাভাবে পরিবেশ শিক্ষায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

তবে সরাসরি পরিবেশ শিক্ষায় সকলকে ছোটবেলা থেকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই প্রধান।

8.5 গণমাধ্যম (Massmedia)

পরিবেশ শিক্ষার প্রথাবহির্ভূত সংস্থা হিসাবে গণ্য না হলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তি এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সব মাধ্যমগুলিকে পরিবেশ শিক্ষার প্রথাগত বা

প্রথাবহির্ভূত কোন প্রকার সংস্থাই বলা যায় না কারণ গণমাধ্যমের নানা বিচিত্র ও বহুবিধ কর্মকাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ পরিবেশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সচেতনভাবে পরিবেশ শিক্ষাদান এদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরিবেশ বিষয়ক তথ্য, সমস্যা, নীতি, ইত্যাদি প্রচার করার ক্ষেত্রে এই সব গণ্য মাধ্যমের বিশেষ কিছু সুবিধা আছে। যেমন,

- অত্যন্ত সহজে নিয়মিত তথ্য প্রচার করতে পারে।
- তথ্য গ্রাহক জনসাধারণ সামান্য ব্যয়ে অথবা প্রায় বিনা ব্যয়ে তথ্য পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য তাঁদের কোন স্বতন্ত্র ব্যয় করতে হয় না।
- এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।
- বিনোদনের মাধ্যমেও অনেক কিছু শেখা বা জানা যায়।
- বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে।
- অধিকাংশ মানুষের কাছে গণ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।
- খুব সহজেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে দিতে পারে। এই বিতর্কে জনসাধারণও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের মতামত তৈরি করে নিতে পারে।

বিশেষ কয়েকটি গণমাধ্যম সম্বন্ধে সংক্ষেপে ও স্বতন্ত্রভাবে নিচে উল্লেখ করা হল।

8.5.1 সংবাদপত্র (Newspaper)

সাধারণ সংবাদপত্র দৈনিক প্রকাশিত হয়। কোন কোন সংবাদপত্র সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক হলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য সংবাদ পরিবেশন নয়। সংবাদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। দৈনিক সংবাদ পত্রগুলি পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে তার মধ্যে আছে,

- পরিবেশ বিষয়ক যে কোন সংবাদ পরিবেশন।
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ।
- নিজেদের সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
- পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য (যেমন, কোন বড় শহরের বাতাসে প্রতিদিনকার ধূলিকণার পরিমাণ, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা, সালফার ডাই অক্সাইডের মাত্রা ইত্যাদি) প্রকাশ।
- সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করা ও পর্যালোচনা করা।
- চিঠিপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ।
- কখনও কখনও জনমত গঠনের প্রয়াস।
- পরিবেশ সংক্রান্ত দাবি উত্থাপন।

সংবাদপত্রের সুবিধা এই যে, এই মাধ্যম ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত সবার ঘরেই সহজে পৌঁছে যায় এবং তাদের পরিবেশিত সংবাদ ও তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সবার কাছেই অত্যন্ত বেশি।

8.5.2 রেডিও (Radio)

এক সময়ে রেডিও ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়, ব্যাপক ও গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যম। বর্তমানে রেডিও প্রধানত বিনোদনের

মাধ্যম হলেও গ্রামাঞ্চলে, বিশেষভাবে যে সব সুদূর অঞ্চলে সংবাদ পত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি সহজলভ্য নয়, সেই সব অঞ্চলে এখনও রেডিওর গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লি মঙ্গলের আসর, পল্লি কথা, কৃষিকথার আসর জাতীয় প্রোগ্রামগুলি শোনার আগ্রহে, এবং প্রতিদিনকার খবর শোনার জন্য গ্রামাঞ্চলে বহুলোকের একস্থানে জড়ো হওয়ার দৃশ্য খুব বিরল ছিল না। এইসব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে রেডিওর ভূমিকা সংবাদপত্রের চেয়েও ব্যাপক হতে পারে। এর সুবিধাগুলি উল্লেখ করলেই এই কথা সহজে প্রতীয়মান হবে।

- রেডিও নানা আকৃতির হয়, অধিকাংশ সময়ই পকেটে নিয়ে বেড়ানো যায়।
- যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় রেডিও শোনা যায়। এমনকি অন্ধকারেও রেডিও শোনায় কোন সমস্যা নেই।
- একবার রেডিও কিনলে মাঝে মাঝে ব্যাটারি পরিবর্তন ছাড়া আর কোন খরচ নেই।
- একজন রেডিও শুনলে আশেপাশে সবাই শুনতে পায়। সংবাদপত্রের মত একবারে একজন নয়, একবারে অনেকে শুনতে পায়। এমনকি অনিচ্ছুক হলেও কানে যায়।
- রেডিওতে বিনোদন ও শিক্ষা এক সঙ্গে হতে পারে।
- একই কথা বারে বারে নানাভাবে প্রচার করা যায়। এরফলে কোন তথ্য জানতে না চাইলেও জানা হয়ে যায়।

এই সব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে রেডিও অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

8.5.3 ইলেকট্রনিক মাধ্যম (Electronic media)

প্রধানতম ইলেকট্রনিক মাধ্যম অতি অবশ্যই টেলিভিশন। টেলিভিশন প্রায় প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন অত্যন্ত শক্তিশালী বিনোদন ও গণমাধ্যম। শ্রবণ ও দৃশ্য দুটি সংবেদন প্রক্রিয়া একযোগে ব্যবহৃত হওয়ায় টেলিভিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অসাধারণ। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন ঘটনা, তথ্য বা দৃশ্য সরাসরি তৎক্ষণাৎ টেলিভিশনে দেখানো হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতামত, তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ টেলিভিশনে সহজলভ্য। এই সব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা গণ্যমাধ্যমগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

এই সব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশন সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা নিতে পারে। টেলিভিশনের উপরোক্ত সুবিধাগুলি ছাড়াও আরও কিছু সুবিধা আছে। যেমন,

- রেডিওর মত এক সঙ্গে অনেকে দেখতে পারে।
- রঙীন দৃশ্য আকর্ষণীয় ও সঠিক চেহারায় ঘটনাকে তুলে ধরতে পারে।
- অসংখ্য চ্যানেল ও নানা বিচিত্র ধরনের চ্যানেল থাকায় প্রতিটি চ্যানেলেই কিছু কিছু পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া যেতে পারে।
- ব্যয়বহুল হলেও বিনোদনমূলক আকর্ষণের জন্য অনেকেই এই ব্যয় করে থাকেন এবং অক্ষমদের দেখার সুযোগ দিয়ে থাকেন।
- বিদ্যুৎ ছাড়াও আজকাল সৌরশক্তি বা অন্য অপ্রচলিত শক্তির সাহায্যে টেলিভিশন দেখা সম্ভব।

একথা মনে রাখা দরকার, টেলিভিশন সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলেও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের মাধ্যম মোবাইল ফোন (Cell phone) এখন একাধারে টেলিফোন,

টেলিভিশন ও কম্পিউটারের সমকক্ষ হয়ে উঠছে। যদিও অধিকাংশ সুবিধা এখনও বেশির ভাগ মানুষের নাগালের বাইরে। তা হলেও পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বিপুল।

শহরের মানুষ এবং গ্রামের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কাছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল কম্পিউটার নির্ভর অন্তর্জাল (Internet) ব্যবস্থা। বিশ্বজোড়া অন্তর্জালের (www) মাধ্যমে যে কোন তথ্য যে কোনও সময়ে পাওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত ব্লগ পদ্ধতিও শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব মাধ্যমের সবকিছুই সদর্থকভাবে ব্যবহার করতে হবে। নেতিবাচক মাধ্যম হিসাবে এরা যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতাও রাখে। এই সব মাধ্যম কতটা পরিবেশবান্ধব ভূমিকা নেবে তা নির্ভর করে সদিচ্ছা, সততা ও নিষ্ঠার উপর।

8.5.4 অন্যান্য মাধ্যম (Other Media)

প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য। প্রচারভিত্তিক, বিনোদন ভিত্তিক, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভিত্তিক অসংখ্য মাধ্যম পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় কিন্তু পরোক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল, তা নমুনা মাত্র।

সাহিত্য—গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি।

সঙ্গীত— গণসঙ্গীত, লোক সঙ্গীত ইত্যাদি।

অভিনয়— যাত্রা, নাটক, একক অভিনয়, পথনাটিকা ইত্যাদি।

আঞ্চলিক— প্রথা, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

চিত্রকলা—পোষ্টার, পটশিল্প, দেওয়াল চিত্র, অলঙ্করণ ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র— পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, ডকুমেন্টারি, প্রচারচিত্র ইত্যাদি।

8.6 সার সংক্ষেপ (Summary)

কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংঘবদ্ধ প্রয়াস যখন সচেতনভাবে পরিবেশ শিক্ষার আয়োজন করে তখন তাকে বলা হয় পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা। পরিবেশ শিক্ষার দুই প্রকার সংস্থা আছে— প্রথাগত সংস্থা এবং প্রথা বহির্ভূত সংস্থা। প্রথাগত শিক্ষার যে সব প্রতিষ্ঠান আছে যেমন, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি, সেগুলিই প্রথাগত সংস্থা। কারণ, এই সব প্রতিষ্ঠানে, এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, পরিকল্পিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষকরা শিক্ষাদান করেন। প্রথাগত শিক্ষার সমস্তরকম সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়। তাই বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন স্বতন্ত্র আয়োজন দরকার হয় না। তবে সেই সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার সমস্যাগুলিও এক্ষেত্রে বর্তমান।

প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার মতই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রাথমিক স্তরে সরাসরি পরিবেশ শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই স্তরে শুধু মাত্র পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিবেশের পরিচিতি ঘটানো হয়। মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি তৈরি হয়। কারণ এখানে নানা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যেমন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার্থীরা তেমনি তার কার্যকারণ সম্পর্কগুলিও বুঝতে শেখে। তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল, শিখন ক্ষমতা প্রভৃতি এক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষাকে সার্থক করে তোলে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষাকে আরও গভীরতর করে তোলা হয়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে পরিবেশের নানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচিত

হয়। এছাড়াও আছে পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশের সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা করে নতুন বিষয় জানার প্রক্রিয়া যা উচ্চতম স্তরেই সম্ভব। পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আর এক ধরনের পেশাগত সংস্থা।

প্রথা বহির্ভূত সংস্থা মূলত যারা প্রথাগত সংস্থার প্রথাগত শিক্ষার আওতায় নেই সেই সব মানুষের জন্য প্রথাগত সংস্থাগুলিও কিছু কিছু প্রথাবর্হিভূত শিক্ষার আয়োজন করে থাকে। প্রথাবহির্ভূত সংস্থা বিপুল ও বিচিত্র। সরকারি পরিবেশ দপ্তর, সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রথাবহির্ভূত সংস্থা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এছাড়াও আছে নানা রকম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গণ মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এদের মধ্যে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রধান। প্রত্যেকটিরই পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক মাধ্যম ও চলচ্চিত্র প্রধান।

8.7 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা কাকে বলে?

(খ) প্রথাগত সংস্থা কথাটির অর্থ কি?

(গ) প্রথা বহির্ভূত সংস্থার দুটি উদাহরণ দিন।

(ঘ) প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার স্তরগুলি কি কি?

(ঙ) মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি নির্মিত হয় কেন?

(চ) প্রথাগত সংস্থাগুলি কোন ক্ষেত্রে প্রথা বহির্ভূত ভূমিকা নিতে পারে?

(ছ) গণমাধ্যম হিসাবে রেডিও ও সংবাদপত্রের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ব্যাপক?

(জ) গণ মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন আকর্ষণীয় কেন?

(ঝ) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠানের ভূমিকা কি?

(ঞ) ইন্টারনেট পরিবেশ শিক্ষায় কি ভূমিকা নিতে পারে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত?

(খ) মাধ্যমিক স্তরে কিভাবে পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়?

(গ) সাহিত্য ও ইতিহাস কিভাবে পরিবেশ শিক্ষার বাহন হতে পারে?

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়গুলির ভূমিকা কি?

(ঙ) পেশা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষার ব্যবস্থা কেমন থাকবে?

(চ) প্রথা বহির্ভূত সংস্থা কাকে বলে? পরিবেশ শিক্ষায় পরিবেশ দপ্তরের ভূমিকা কি?

(ছ) পরিবেশ শিক্ষায় এন. সি. ই. আর টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি?

(জ) পরিবেশ শিক্ষায় রেডিও কি ভূমিকা নেয়?

(ঝ) গণমাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রের সুবিধা কি?

(ঞ) প্রচলিত গণমাধ্যমগুলি ছাড়া অন্যান্য গণমাধ্যমগুলির পরিচয় দিন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা কাকে বলে? প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থাগুলি ও তাদের ভূমিকা বিশদ আলোচনা করুন।

(খ) প্রথা বহির্ভূত সংস্থা কাদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার কাজ করে? সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির পরিচয় দিন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক 9 □ পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এবং ধারা (Curriculum and Approaches of Environmental Education)

গঠন

9.1 সূচনা

9.2 উদ্দেশ্য

9.3 পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতি

- 9.3.1 পাঠক্রমের সমন্বয়
- 9.3.2 পাঠক্রমের সম্প্রসারণ
- 9.3.3 আনুভূমিক ও উল্লম্ব নীতি
- 9.3.4 পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য
- 9.3.5 পাঠক্রম রচনার অন্যান্য নীতি

9.4 পাঠক্রমের বিষয়বস্তু

- 9.4.1 প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্তু
- 9.4.2 মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্তু
- 9.4.3 উচ্চতর স্তরের বিষয়বস্তু

9.5 পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি

- 9.5.1 গতানুগতিক পদ্ধতি
- 9.5.2 আধুনিক পদ্ধতি
- 9.5.3 অন্যান্য পদ্ধতি

9.6 পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক শিখন

9.7 সারসংক্ষেপ

9.8 প্রশ্নাবলি

9.1 সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী এককে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংস্থা কিভাবে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে নানারকম ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সম্ভাব্য পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা এই প্রসঙ্গে পাওয়া গেছে। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মত একটি বাধ্যতামূলক আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখলে প্রথম যে প্রশ্নটি মনে আসে সেটি হল পরিবেশ শিক্ষার

পাঠক্রম কি হবে এবং তার অন্তর্গত বিষয়বস্তুই বা কি হবে। শুধু তাই নয় যে কোন পাঠক্রমের সার্থকতা তাকে পঠন পাঠনের মাধ্যমে কার্যকর করে তোলার মধ্যে দিয়ে। সেজন্য এই প্রশ্নও অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে যে পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতিই বা কেমন হবে।

বর্তমান এককে এই বিষয়গুলিই সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। প্রথমেই দেখতে হবে বিদ্যালয় বা উচ্চতর স্তরে পরিবেশ শিক্ষার স্থান কোথায় থাকবে। সেজন্য পাঠক্রম রচনার নীতি পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যগুলি স্থির করে নেওয়া দরকার। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়বস্তু ও শিক্ষণের প্রসঙ্গ আসবে।

9.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা,

- পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির ভালো মন্দ বিচার করতে পারবেন।
- পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

9.3 পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতি (Principles of Environmental Education Curriculum)

পরিবেশ শিক্ষা অথবা অনুরূপ যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা বর্তমান সময় ও সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, সেগুলির পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নীতিগত সমস্যা দেখা দেয়। যে কোন বিষয়ের পাঠক্রমের ক্ষেত্রেই এই নীতিগত প্রশ্নগুলি আছে কারণ পাঠক্রম রচনার প্রথম ধাপটিই হল, কোন্ নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম রচনা করা হবে সেটি স্থির করে নেওয়া। এখানে নীতি কথাটির অর্থ দিক্ নির্দেশক বা অভিমুখ (approach) বিষয়ক নীতি। নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম রচনা করা না হলে তা উদ্দেশ্যহীন ও খাপছাড়া হতে বাধ্য।

9.3.1 পাঠক্রমের সমন্বয় (Integration of Curriculum)

যে কোন পাঠক্রম রচনার একটি সর্বজন গ্রাহ্য নীতি হল পাঠক্রমের সমন্বয়। এই নীতির প্রধান কথা, সমগ্র পাঠক্রমটিকে সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য, ধারাবাহিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার করে সংগঠিত ও আবশ্যিক ধারণা সৃষ্টি করার উপযোগী পাঠক্রম রচনা করা। এই জাতীয় পাঠক্রমের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। সমন্বিত পাঠক্রমে (Integrated curriculum) মনে করা হয়, জ্ঞান শুধুমাত্র বহু বিচ্ছিন্ন তথ্যের যোগফল মাত্র নয়। জ্ঞান একটি সংগঠিত সদা পরিবর্তনশীল, সক্রিয় একক।

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের ক্ষেত্রে সমন্বয় কথাটির অর্থ, অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় পাঠ্য হিসাবে ইতিমধ্যেই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার উপাদানগুলিকে সমন্বিত করা। যেমন, উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ (Photosynthesis) সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়াবার সময় বনসৃজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত

করা, অথবা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রসঙ্গটি পড়ানোর সময় নদীর জল দুষিত হলে মানুষের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করা, ইত্যাদি।

সমন্বিত পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য—

- এখানে বিষয়বস্তুর কোন গণ্ডী রাখা হয় না। যে কোন বিষয়ের সঙ্গে যেকোন বিষয়ের যৌক্তিক, বিষয় বস্তুগত বা অন্য কোন সম্বন্ধ থাকলেই তাদের সমন্বিত করা যায়।
- শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো হয়।
- শিক্ষক জ্ঞানের সমন্বয়কারী হিসাবে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন তথ্য সরবরাহ করেন না, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা ও বিচারবোধকে উদ্দীপিত করতে চেষ্টা করেন।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সুবিধা হল,—

- শিক্ষার্থীদের কখনই মনে হয় না তারা অতিরিক্ত একটি বিষয় পড়তে বাধ্য হচ্ছে।
- পরিবেশের সমস্যাগুলি অনুধাবন করার জন্য তাদের নিজস্ব বিচারবোধ পরিশীলিত হয়।
- শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত বিষয় পড়ানোর চাপ থাকে না।
- শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে ক্রমাগত বৈচিত্র্য আনার জন্য কখনই এক ঘেয়ে মনে হয় না।
- শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সম্বন্ধে স্থায়ী সংহত জ্ঞান লাভ করে যা সারা জীবন স্থায়ী হয়।
- তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়ে।

এর দুই একটি অসুবিধাও আছে। যেমন,—

- অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটালে অনেক সময়ই পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গটি গৌণ হয়ে পড়ে। তার কার্যকর কোন প্রভাব বাস্তবে দেখা যায় না।
- শিক্ষক যথেষ্ট তৎপর এবং জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ (Resourceful) না হলে সমন্বয়ের উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে।
- সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্ভব নাও হতে পারে।
- বুদ্ধিমান, সাধারণ বা দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের বেলায় সমন্বয় প্রক্রিয়ার প্রভাব আলাদা হতে পারে।
- মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করার সময় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু যথেষ্ট গুরুত্ব না পেতে পারে।

এই সব কারণে পাঠক্রম সমন্বয়ের নীতি শেষপর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ বলে গণ্য হয়।

9.3.2 পাঠক্রমের সম্প্রসারণ (Expansion of Curriculum)

এই নীতি সমন্বয় নীতির বিপরীত। সমন্বয়ের বেলায় যেখানে পাঠক্রমের সংকোচন ঘটে, এই নীতির ফলে পাঠক্রম প্রসারিত হয়, অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষা নতুন বিষয় হিসাবে পাঠক্রমে স্থান করে নেয়। পাঠক্রমের সম্প্রসারণ দুই ভাবে হতে পারে। একটিতে সরাসরি 'পরিবেশ শিক্ষা' নামে পাঠক্রমে একটি অতিরিক্ত পত্র যুক্ত করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুটি আলাদা করে পড়ে, পরীক্ষা দেয়। তার জন্য আলাদা বই, শিক্ষক এবং সময় নির্দিষ্ট থাকে। আর একটিতে স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসাবে যুক্ত না করে বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক অংশগুলি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ হিসাবে ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির পাঠক্রমে জুড়ে দেওয়া হয় এবং কিছুটা সমন্বয় সাধনও করা হয়। এর

ন্য আলাদা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক বা সময় দরকার হয় না ঠিকই তবে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে প্রতিটি অংশ পাঠ করে।

পাঠক্রম সম্প্রসারণের সুবিধা হল,—

- স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি পড়ে।
- আলাদা সময় ও শিক্ষক নিয়োজিত হলে, শিক্ষার্থীরা ক্রমশ একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছে পরিবেশ শিক্ষা পেতে পারে।
- সমন্বয় ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংযোগ পরিবেশ শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রেখেও করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে প্রকৃতই পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠে।

সুবিধাজনক হলেও, এর অসুবিধাও কম নয়,

- ছাত্রছাত্রীদের উপর নতুন বিষয়ের বোঝা বাড়ে, তাদের পরিশ্রমও বাড়ে।
- আর একটি পরীক্ষা সর্বস্ব নতুন বিষয়ে পরিণত হয়ে পরিবেশ শিক্ষা তার গুরুত্ব হারায়।
- নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা অনেক সময়ই আর্থিক কারণে ও উপযুক্ত লোকাভাবে সম্ভব হয় না। তখন পরিবেশ শিক্ষা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষায় পরিণত হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।
- পরিবেশ শিক্ষা প্রকৃত পরিবেশ নির্ভর না হয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্ভর হয়ে পড়ে।

এই সব কারণে পাঠক্রমের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নীতিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে বর্তমানে অনেক দেশে এবং অনেক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার জন্য সম্প্রসারণ নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

9.3.3 আনুভূমিক ও উল্লম্ব নীতি (Horizontal and Vertical Principle)

প্রকৃত অর্থে কথাটি আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের নীতি। সাধারণভাবে পাঠক্রমের আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের প্রসঙ্গটি প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আলোচিত হয়ে থাকে। পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে আনুভূমিক সম্প্রসারণ কথাটির অর্থ কোন একটি স্তরের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, বয়স ও শিখন ক্ষমতাকে অতিক্রম না করে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সব তথ্য তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জানতে আগ্রহী তার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষার আয়োজন করা। প্রত্যেক বয়সের শিশুরই তার চার পাশের জগৎ সম্বন্ধে তীব্র কৌতূহল থাকে, সে জানতে চায়, বুঝতে চায় বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক। স্কুল পাঠ্য বিষয় তার কৌতূহলকে কিছুটা নিরসন করতে পারে কিন্তু তা আংশিকমাত্র। সেজন্য পাঠক্রমের পরিকল্পনা এমনভাবে করা সম্ভব যে সমন্বয় বা সম্প্রসারণ যাই হোক না কেন তা তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক হবে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু স্কুলপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক, এই নীতি অনুযায়ী কখনই শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত মনে হয় না।

অন্যদিকে, উল্লম্ব সম্প্রসারণ নীতির অর্থ, পাঠ্য বিষয়কে সব সময়ই কিছুটা অগ্রগামী রাখা। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সবসময়ই কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। এর স্বপক্ষে যুক্তি এই যে পাঠক্রম যদি বিকাশধারাকে অনুসরণ করে তবে কখনই বিকাশ প্রক্রিয়ার বাঁধা পথের বাইরে অগ্রগতি ঘটবে না। সেজন্য স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপেক্ষা না করে তার বিকাশকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি অনুযায়ী মনে করা হয়, শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল ও আগ্রহের উপর নির্ভর না করে তার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার উপযোগী পাঠক্রম তৈরি করা দরকার। পরিবেশের মধ্যে নানা পরিবর্তন,

অসঙ্গতি, ইত্যাদির প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তার মধ্যে প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞাত তথ্যের বা ঘটনার প্রতি তার আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হবে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের নীতি দুই-ই যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। সেজন্য, এই দুই প্রকার সম্প্রসারণের একটিকে অপরটির বিকল্প মনে করলে ভুল হবে। বরং উভয় নীতির সম্মিলিত প্রয়োগ পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমকে বেশি কার্যকর করে তুলতে পারবে বলে মনে হয়।

9.3.4 পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য (Objectives of Curriculum)

সাধারণভাবে পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষা তথা শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাস বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। তবে পরিবেশ শিক্ষা বিশারদরা স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি নির্বাচিত উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। সে হিসাবে নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

সচেতনতা (Awareness)—শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্যদের মধ্যে পরিবেশ ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, পরিবেশের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা তৈরি করা, দলগত কাজ ও একক আচরণকে পরিবেশ বান্ধব করে তোলার জন্য চেতনা জাগ্রত করা, পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের উদ্দেশ্য।

জ্ঞান (Knowledge) — সমস্ত মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধীয় নানা বিচিত্র তথ্য জানা, বোঝা (Understanding), বিশ্লেষণ (Analysis), জ্ঞান প্রয়োগ করা (Application), সংশ্লেষণ (Synthesis), মূল্যায়ন (Evaluation) ইত্যাদির উদ্দেশ্যে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি হওয়া দরকার।

প্রতিন্যাস (Attitude) — পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এমন হওয়া দরকার যা সমস্ত মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধে ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে তুলবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে স্থায়ী মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। শিক্ষার অনুভব বর্গের উদ্দেশ্য (Affective domains of Educational objectives) এই বিষয়টিকেই স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করেছে, যার চূড়ান্ত পর্যায় হল চরিত্রায়ন (Characterisation)।

দক্ষতা (Skill) — পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য, পরিবেশ বান্ধব আচরণের জন্য এমনকি পরিবেশ শিক্ষা আয়ত্ত করার জন্য যে সমস্ত বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এখানে সেগুলির কথাই বলা হয়েছে। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম শুধুমাত্র প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) ও অনুভবমূলক (Affective) উদ্দেশ্যভিত্তিক হবে না, প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি অর্জন করার সমান সুযোগ সেখানে থাকা দরকার।

এক কথায় সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যও একই রকমভাবে তিনটি বর্গে বিভক্ত এবং পাঠক্রমে তার যথাযথ প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

9.3.5 পাঠক্রমের অন্যান্য নীতি (Other Principles of Curriculum)

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার আরও কয়েকটি নীতি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই নীতিগুলিকে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার **প্রত্যক্ষ নির্দেশমূলক নীতি (Direct guiding principle)** বলা হয়।

- পরিবেশকে তার স্বাভাবিক, কৃত্রিম, প্রযুক্তিমূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, নান্দনিক ইত্যাদি যত প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায়, তার সামগ্রিক একটি স্বরূপ হিসাবে বিচার করতে হবে এবং উপযুক্ত স্তরে উপযুক্ত বিষয় স্থান দিতে হবে।

- পরিবেশ শিক্ষাকে ধারাবাহিক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসাবে বিচার করতে হবে, প্রথাগত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা যাই হোক না কেন।
- পরিবেশ শিক্ষাকে একটি আন্তর্বিদ্যা (Interdisciplinary) চর্চার বিষয় হিসাবে দেখতে হবে।
- পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশি (বিষয়টি পরে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য দ্রষ্টব্য)।
- পরিবেশের সমস্ত সমস্যা ও বিষয়বস্তুকে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।
- বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম সেইভাবে রচিত হওয়া দরকার।
- পরিবেশের জটিল রূপ ও সমস্যার জটিলতার রূপ এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বিকাশ হয়।
- পারস্পরিক সহযোগিতা, মূল্যবোধ, পরিবেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পাঠক্রমে থাকা দরকার।
- বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন পদ্ধতি ও শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ থেকে শেখার আয়োজন পাঠক্রমে থাকা চাই।
- পরিবেশকে জানার এবং বোঝার, সমস্যাগুলি অনুধাবন করে তার প্রতিকার নির্ণয় করার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বকীয় ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন।
- শিক্ষার্থীরা যাতে পরিকল্পনা তৈরি করা, পরিকল্পনার ভালোমন্দ বিচার করা এবং পরিকল্পনা কার্যকর করার দক্ষতা আয়ত্ত করে সেটাও দেখা দরকার।

এক কথায় পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাপী কর্মসূচি যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন, অবসর বিনোদন, আনন্দ উৎসব সবকিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবে।

9.4 পাঠক্রমের বিষয়বস্তু (Contents of Curriculum)

পূর্বোক্ত নীতিগুলির মধ্যে দিয়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিন্যাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি উদ্দেশ্যগুলি ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। সেজন্য শিক্ষার্থীদের বয়স ও শিক্ষার স্তর অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিন্যাস হওয়ার প্রয়োজন। এখানে প্রধানত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষার সম্ভাব্য পাঠ্যসূচির ধারণা দেওয়া হয়েছে।

9.4.1 প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্তু (Contents of Primary Level)

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি খুবই সুনির্দিষ্ট। এর মধ্যে আছে—

— মাতৃভাষায় পড়ার দক্ষতা অর্জন করা।

— মাতৃভাষায় লেখার দক্ষতা অর্জন করা।

— সংখ্যা, গণনা, সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা অর্জন।

— পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিচিতি। এর মধ্যে সামাজিক ও জৈব পরিবেশও আছে।

— স্বাস্থ্যবিধি, সাধারণ রোগ ব্যাধি, শরীর চর্চা, খেলাধূলা ইত্যাদি সম্বন্ধে কার্যকর জ্ঞান।

— স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা অর্জন।

— দেশের অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা।

— সৃজনশীলতার বিকাশ, সুস্থ বিনোদন ও সক্রিয়তার আনন্দ।

এই সব উদ্দেশ্যগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে এবং অনেকটাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানোর্জনের মাধ্যমে শেখানো হয়। এর সব কয়টিই কোনও না কোন ভাবে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

সাহিত্য — সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু গল্প বা ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ (যেমন, সেকালের গোপাল ভট্টাচার্য বা জগদানন্দ রায়ের লেখা), ছড়া, কবিতা ইত্যাদি সংযোজন করা যায়, যেগুলি চারপাশের গাছপালা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে ছোটদের কৌতূহলী করে তুলবে এবং পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করবে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য কিছুমাত্র কম থাকবে না।

গণিত— দৈনন্দিন জীবনে পাটীগণিতের প্রয়োগ, অর্থাৎ গণনা, শ্রেণি বিভাগ, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি যথেষ্ট কাজে লাগানো যেতে পারে। গণিতের সমস্যাগুলির মধ্যে চারপাশের প্রাকৃতিক ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রা থেকে গৃহীত অনেক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র টাকা পয়সা, ক্রয় বিক্রয়, অবান্তর পরিমাপের সমস্যা না দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের যাতে সমস্যা তৈরি করা, সমস্যার অনুসন্ধান করা ও তার সমাধান করার কাজে নিয়োজিত করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃতি বিজ্ঞান — প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সরাসরি পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। এখানে এমনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা দরকার যা বই পড়ার থেকে বেশি চারপাশের জগৎ পর্যবেক্ষণ করে, নমুনা সংগ্রহ করে, হাতে কলমে পরীক্ষা করে শেখা যায়। পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, নোটবুক তৈরি করা, নিজেদের মধ্যে আলোচনা, আদান প্রদান করার জন্য সুযোগ থাকলে, শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই তার প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করবে এবং ভালোবাসতে শিখবে।

ভূগোল— স্থানীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, কৃষি সম্পদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় (যেমন, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি) ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা ও তার সহজবোধ্য কারণ ব্যাখ্যা করা এই সব বিষয় সরাসরি পরিবেশ পর্যবেক্ষণে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান — একইভাবে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে ধারণা গঠনে উৎসাহিত করা যায়। সাধারণ রোগ, তার প্রতিকার, পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা, এরকম অনেক বিষয় পরিবেশ শিক্ষার খুব ভালো বাহন হয়ে উঠতে পারে।

ইতিহাস— ইতিহাসের গল্প, দেশের নানা মনীষীদের পরিচিতি, অতীতের বিখ্যাত কোন ঘটনা, সবকিছু থেকেই পরিবেশ শিক্ষার পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়।

শিল্প, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা — আঞ্চলিক ও জাতীয় নৃত্য, সঙ্গীত, কলা ও কারুশিল্পের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি এই স্তরে খুব ভালোভাবে হতে পারে। এই সব কার্যাবলীকে মাধ্যম করে পরিবেশ শিক্ষার কাজ খুবই ফলপ্রসূ হয়। যেমন, পরিবেশ থেকে উপাদান নিয়ে চিত্রাঙ্কন, পরিবেশ সমস্যার পোস্টার তৈরি করা, প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং তুলি তৈরি করে নেওয়া, ইত্যাদি অনেক সম্ভাবনার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

এক কথায়, সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাই পরিবেশ ভিত্তিক। পরিবেশের মাধ্যমে, পরিবেশের জন্য পরিকল্পনা করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে কোন রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পাঠক্রমের কাঠামো ও নির্দেশিকা তৈরি করে আঞ্চলিক ভাবে তার কিছুটা নমনীয় পরিবর্তন করার সুযোগ থাকা দরকার। বর্তমান শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ারও আমূল পরিবর্তন করা দরকার। কারণ গতানুগতিক পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু পরিবেশ শিক্ষার পক্ষে কিছুটা অনুপযোগী।

9.4.2 মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্তু (Contents of Secondary Level)

পরিবেশ শিক্ষার গোড়াতে ষষ্ঠ এককেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম International Working Meeting on Environmental Education, বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে আর ব্যাপকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের উপর উপরোক্ত আলোচনায় বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অষ্টম এককেও এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কেন্দ্রীয় পাঠক্রম (Corecurriculum) ভিত্তিক। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সর্বজনীন অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান ও দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাথমিক স্তরের মত এত বেশি আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ থাকা মাধ্যমিক স্তরে সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা মূলত কৈশোরকালীন শিক্ষা। সেজন্য এখানে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেলেও তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিও এখানে থেকেই তৈরি হয় তাই অনেকেই মনে করেন, অন্যসব বিষয় বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে (Horizontal expansion) পরোক্ষভাবে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষাদান কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবে না। সেজন্য দরকার পরিবেশ শিক্ষাকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শেখানো। তবে অন্যান্য বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া সম্ভব।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিবেশ শিক্ষার উপাদান হিসাবে যুক্ত হতে পারে। যেহেতু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে সাত বৎসর সময় পাওয়া যায় সেহেতু একে একে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্ত প্রাথমিক তথ্য ও সমস্যা এই স্তরের ছাত্রছাত্রীরা শিখতে পারে।

- পরিবেশের ভৌত উপাদান, বায়ুমণ্ডল, বায়ুর উপাদানগুলির অনুপাত ও তার তাৎপর্য। বায়ু দূষণ, তার প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার।
- জীব পরিমণ্ডল ও জীব বৈচিত্র্য। স্বাভাবিক পরিবেশ, খাদ্য বৈচিত্র্য, খাদ্য-খাদক শৃঙ্খল। খাদ্য শৃঙ্খলে বিপর্যয়, তার কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার।
- পৃথিবীর উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। উদ্ভিদের সঙ্গে ভৌত পরিবেশ, প্রাণিজগৎ ও মানুষের সম্পর্ক। অরণ্য বিলোপের কারণ ও ফলাফল। বনসৃজনের গুরুত্ব ও সমস্যা।
- সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণি জগৎ। কৃষি সম্পদ, খাদ্যোৎপাদন ও জনসংখ্যা, খাদ্য ও জীবনযাত্রার মান। কৃষি সম্পদের উপর পরিবেশ দূষণের প্রভাব এবং কৃষিক্ষেত্র থেকে বায়ু ও জল দূষণ, প্রতিকার ও প্রভাব।
- জল সম্পদ, জলের উৎস, ভূস্তরের জলের উৎস, দূষণ, প্রভাব ও প্রতিকার। ভূগর্ভস্থ জল ও তার ব্যবহার জল সম্পদের সংরক্ষণ।
- খনিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা, খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার, বিকল্প ব্যবহার।
- শক্তি ও জ্বালানি, শক্তির উৎস, শক্তির অপচয়, অপ্রচলিত শক্তির নানা উৎস। শক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্ত প্রসঙ্গ।
- উষ্ণায়ন ও তার প্রভাব, প্রতিকার। গ্রিন হাউস গ্যাস ও তার প্রভাব।

● মানব সভ্যতার বিকাশ ও পরিবেশের সঙ্গে মানব সভ্যতার সম্পর্ক। বর্তমান সভ্যতার সংকট।

প্রযুক্তি, প্রযুক্তি নির্ভর জীবন, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দূষণ, বিকল্প প্রযুক্তি।

নগরায়ণ (urbanisation) জনিত সমস্যা, বর্জ্য পদার্থ, গার্হস্থ্য বর্জ্য ও কল কারখানার বর্জ্য পদার্থ জনিত সমস্যা। বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা।

পরিবেশ সচেতনতার অর্থ ও গুরুত্ব। পরিবেশ সচেতনতার বিকাশ। পরিবেশ বান্ধব জীবন যাত্রা।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিষয়গুলি কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়, নমুনা মাত্র। তাছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নিচু থেকে উঁচু ক্লাসের উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার উপস্থাপনার মান ভিন্ন রকম। বিষয়বস্তুর বিন্যাসও নানা স্তরে নানা রকম হতে পারে। কাজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সম্বন্ধে সমস্ত রকম মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে। সেই সঙ্গে তাদের প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ এই স্তরেই তৈরি হয়ে যাবে। পরবর্তী স্তরে শুধু আরও তাত্ত্বিক জ্ঞান, আরও উন্নত পর্যায়ের তথ্য ও সক্রিয়তার মাধ্যমে পূর্বার্জিত মূল্যবোধের স্থায়ী চরিত্রায়ন ঘটবে।

9.4.3 উচ্চতর স্তরের বিষয়বস্তু (Contents at Higher Level)

এখানে উচ্চতর স্তর কথাটির অর্থ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। যেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্রমশ নির্বাচনধর্মী এবং বিশেষজ্ঞতা অভিমুখী হয়ে ওঠে সেহেতু এই স্তরে পরিবশে বিদ্যা (Environmental Studies) একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। School of Environmental Studies অথবা Department of Environmental Sciences এই জাতীয় নাম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ চর্চা স্বতন্ত্র বিভাগে পঠন পাঠন, গবেষণা, আলোচনা সভা, গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

পরিবেশ বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চতর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বহু বিষয়ের জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ ফল একত্রিত করে পরিবেশ তার সমস্যা ও প্রতিকারের পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করার কাজে বিপুল অগ্রগতি ঘটে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে। পদার্থ বিদ্যা (Physics), জীববিদ্যা (Biology), রসায়ন ও জৈব রসায়ন (Chemistry and Organic Chemistry), কৃষিবিদ্যা (Agricultural Science), প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology), চিকিৎসা বিদ্যা (Medicine), সমুদ্রবিদ্যা (Oceanography), ভূগোল (Geography), ভূবিদ্যা (Geology), সমাজবিদ্যা (Sociology), মনোবিদ্যা (Pshychology) ইত্যাদি এমন কোন বিষয় নেই যা পরিবেশকে জানার ও বোঝার প্রসঙ্গে কিছু না কিছু তথ্য দিতে পারে। এই সব বিষয়গুলি একদিকে যেমন নিজ নিজ ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশ চর্চা করে থাকে তেমনি বিশেষ বিষয় হিসাবে পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

এই দিক থকে দেখতে গেলে, উচ্চতর শিক্ষার পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া কার্যত অসম্ভব, কারণ তা ব্যাপক, বিস্তারিত এবং উন্মুক্ত। ব্যক্তিগত জীবন ধারা, অভ্যাস, রীতিনীতি, সাধারণভাবে পরিবেশ সচেতনতা এই জাতীয় বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় স্তরের পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত বৃহত্তর ও গভীর সমস্যাগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে সমাধান করা যায় না বা করা গেলেও তা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার উপর নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের গুরুত্ব এখানেই। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরিবেশ সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করতে সক্ষম।

উচ্চতর শিক্ষার প্রথম ধাপ, অর্থাৎ কলেজ স্তরে সাধারণভাবে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পরিবেশ বিদ্যার চর্চা খুব কমই করা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রগুলি এক একটি বিষয় হিসাবে কলেজ স্তরে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এই সব বিষয়গুলি পরবর্তী পর্যায়ে গভীরতর পরিবেশ চর্চার ভিত্তি তৈরি করে। কারণ, গবেষণার জন্য প্রতিটি সমস্যাই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে দেখতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় আপাত সরল এক একটি সমস্যা যথেষ্ট জটিল এবং একটির সঙ্গে আর একটি এমনভাবে সম্পৃক্ত যে আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা কখনই সমাধান করা যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান পৃথিবীর একটি প্রধানতম সমস্যা। পৃথিবীতে অতিরিক্ত বেশি জ্বালানি ব্যবহৃত হওয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার সবটা বিকীরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারে না কারণ বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে যে কার্বন মনোক্সাইডের বলয় তৈরি হয় সেখানে প্রতিহত হয়ে আবার তাপ পৃথিবীতেই ফিরে আসে। এর ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, প্রকৃতিক বিপর্যয়, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সামুদ্রিক জল স্তর বৃদ্ধি, জীব বৈচিত্র্যের যে শৃঙ্খল তার পরিবর্তন ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় উষ্ণায়নের অনিবার্য ফল। খুব সাধারণ ও সহজ ভাষায় এই হল বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming)। এই বিষয়টি বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন। এর সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় নিচের চিত্রে উল্লেখ করা হল।

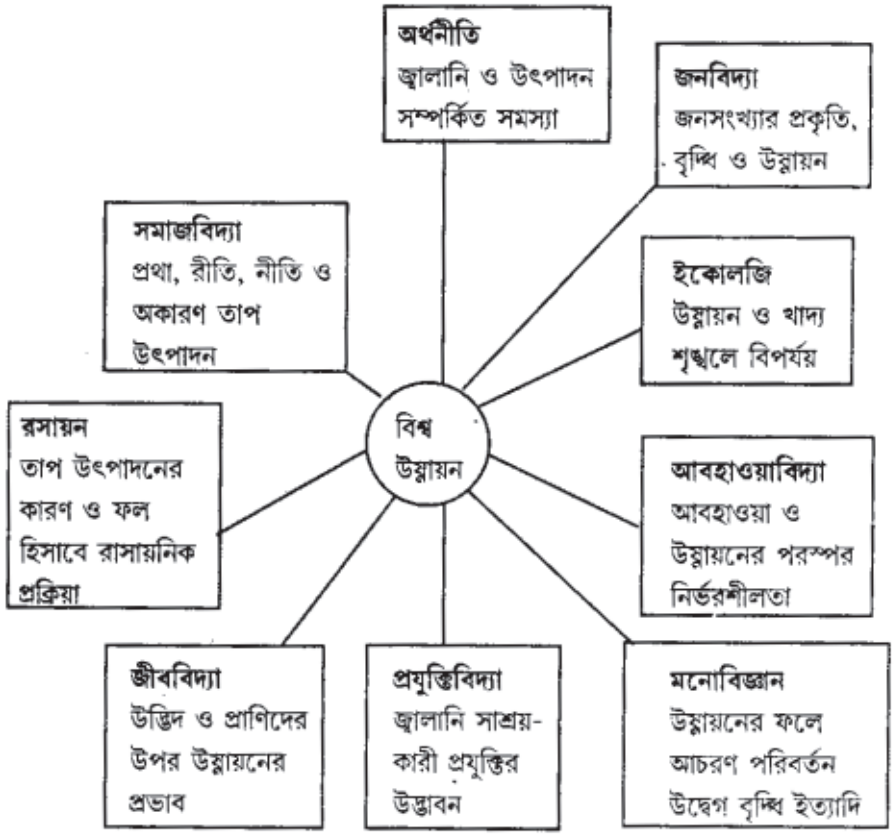

বলা বাহুল্য, বিষয়টির জটিলতা বোঝানোর জন্য এগুলি কিছু স্থূল উদাহরণ মাত্র। প্রকৃত জটিলতা আরও বেশি, যা উচ্চতর শিক্ষার চর্চার বিষয়।

9.5 পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Curriculum and Teaching Methods)

শুধুমাত্র পাঠক্রম কোন শিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করতে পারে না। শিক্ষণ পদ্ধতি পাঠক্রমকে কার্যকর করার প্রধান হাতিয়ার। অনেক ভালো পাঠক্রমও অনুপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য ব্যর্থ হতে পারে। সেজন্য পাঠক্রম সম্বন্ধে ধারণার পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধেও জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক, পরিবেশ শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষণ পদ্ধতি নেই। নানা ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্য থেকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতি বেছে নেওয়া এবং তার সঠিক প্রয়োগই প্রধান কথা। আর দুই, শিক্ষণ পদ্ধতি সর্বস্তরে এক প্রকার হতে পারে না। উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষার স্তর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা দরকার।

9.5.1 গতানুগতিক পদ্ধতি (Traditional Methods)

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত, সহজ এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষণ পদ্ধতি। এর সুবিধা,

— অল্পসময়ে বেশি তথ্য প্রদান।

— ধারাবাহিক ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা।

— সবচেয়ে কম আয়োজন প্রয়োজন।

অসুবিধার মধ্যে আছে,

— ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তার সুযোগ কম।

— ছাত্রছাত্রীরা কতটা জানে, তার বিচার শিক্ষক করেন না।

— একমুখী তথ্যের প্রবাহ, সেজন্য অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতির উপযোগিতা খুবই সামান্য।

প্রদর্শন (Demonstration) — বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি, যদিও অন্যান্য বিষয়েও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক কোন মডেল, পরীক্ষণ পদ্ধতি, কোন পরিবর্তন, নমুনা প্রদর্শন, এই জাতীয় কাজ করে থাকেন। প্রায়ই প্রদর্শনের আগে, পরে এবং প্রদর্শনের সময় বক্তৃতাও আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকে।

এর সুবিধা,—

— ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

— ছাত্রছাত্রীরা কোন কাজ সম্পন্ন করার উপযোগী মডেল পেয়ে যায়।

— একসঙ্গে অনেকের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

— শিক্ষকের পরিশ্রম বাঁচে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা স্থায়ী হয়।

অসুবিধা,—

— পূর্ব প্রস্তুতি এবং উপযুক্ত আয়োজন দরকার।

— অনেক ক্ষেত্রে প্রদর্শন সম্ভব হয় না।

— যদি প্রদর্শনের পর ছাত্রছাত্রীরা হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ না পায়, তবে তাদের নিষ্ক্রিয়ভাবেই শিখতে হয়।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা ক্লাসে প্রদর্শন সম্ভব, সেগুলির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযুক্ত (যেমন, কার্বন ডাই অক্সাইড সংক্রান্ত কিছু কিছু পরীক্ষা)। কিন্তু পরিবেশের সমস্ত বিষয় ক্লাসে কৃত্রিমভাবে ঘটানো যায় না।

পরীক্ষণাগার পদ্ধতি (Laboratory Method) — প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়। যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পরীক্ষণাগার আছে এবং যে সব সমস্যা পরীক্ষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব সেগুলি শিক্ষকের নির্দেশক্রমে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষণাগারে হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এর ফলে প্রদর্শন পদ্ধতির একটি দুর্বলতা দুর হয়। তবে, পরীক্ষণাগার পদ্ধতিও পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত ভাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবে সমস্ত বিজ্ঞান শিক্ষকই একমত যে এর সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়। এখানে এই পদ্ধতিকে গতানুগতিক বলা হয়েছে, কারণ যদি বাঁধা ধরা কয়েকটি পরীক্ষণ শিক্ষার্থীদের পুনরানুষ্ঠান করতে হয়, তবে এই পদ্ধতির আর বিশেষ কোন উপযোগিতা থাকে না।

9.5.2 আধুনিক পদ্ধতি (Modern Method)

আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য, এখানে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অনুসন্ধিৎসু একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী হিসাবে মনে করা হয়। শিক্ষকের ভূমিকা অনেকটাই সাহায্যকারী ও নির্দেশকের। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কি শিখতে হবে, এই প্রচেষ্টার পরিবর্তে কেমন করে শিখতে হবে এই প্রচেষ্টার অভিমুখে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। সমস্ত আধুনিক পদ্ধতিগুলির একত্রিত সার সংক্ষেপ এইরকম—

- শিক্ষক বিষয়বস্তুর চুম্বক তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলেন।
- তাদের নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি করে দেন।
- তিনি তথ্য ও তথ্যের উৎসগুলি তুলে ধরে তাদের আরও তথ্য সংগ্রহে উৎসাহিত করেন।
- তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের জ্ঞানকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেন।
- ছাত্রছাত্রীরা বিতর্ক, আলোচনা, নানা বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এইসব প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে।
- তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে, তা সম্পূর্ণ করে দেন।

আধুনিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

- ধারণা আয়ত্তকরণ পদ্ধতি (Concept attainment method)
- প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem solving method)
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Scientific Inquiry method), ইত্যাদি।

পরিবেশ শিক্ষার পক্ষে আধুনিক পদ্ধতিগুলি খুবই উপযুক্ত। কিন্তু এই জাতীয় পদ্ধতিগুলি কার্যকর করার জন্য শিক্ষকদের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাছাড়া, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সামাজিক পটভূমি সবই গতানুগতিক পদ্ধতির অনুকূল। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষার জন্য আধুনিক পদ্ধতির স্বতন্ত্র প্রয়োগ কঠিন কাজ।

9.5.3 অন্যান্য পদ্ধতি (Other methods)

অন্যান্য পদ্ধতিগুলির সবকয়টিকে সম্পূর্ণ পদ্ধতি বলা যায় না বা পূর্বোল্লিখিত আধুনিক পদ্ধতি থেকে ভিন্ন রকম বলা যায় না। এই সব পদ্ধতিগুলির কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া হল।

আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময় (Discussion and Interaction)— এই পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতিগুলির অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ শিক্ষকের নেতৃত্বে অথবা স্বাধীনভাবে দলগত আলোচনা, আদান প্রদান ও দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আধুনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

সূচিবদ্ধ নিবিড় শিক্ষণ--(Programmed Instruction)— শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সূচিবদ্ধ নিবিড় শিক্ষণ একটি অতি পরিচিত কথা। এই পদ্ধতিতে সমস্ত বিষয়কে অনেকগুলি ছোট ছোট ফ্রেমে ভাগ করে একটি একটি করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর দানের মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে জানা যাচ্ছে যে একটি ফ্রেম শিক্ষার্থী আয়ত্ত করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী ফ্রেম উপস্থিত করা হয় না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী নিজস্ব গতিতে শিখতে পারে। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তথ্য আয়ত্ত করার বাস্তবিক উপযোগিতা কম। এই পদ্ধতি থেকেই Multimedia Package, Computer Aided Instruction, Individualized Instruction, প্রভৃতি পদ্ধতি ও নীতিগুলির উদ্ভব হয়েছে। এর সব কয়টির ক্ষেত্রেই একই সমস্যা। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে পরিবেশ শিক্ষার অর্থ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য আয়ত্ত করা তবে, এই পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট সফল। কিন্তু যদি পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতার বিকাশ ও মূল্যবোধের বিকাশ তবে এই পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী।

পরিবেশ চর্চার পদ্ধতি (Environmental Studies Approech)

পরিবেশ শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি, পরিবেশ চর্চা। এই পদ্ধতির সারকথা, পরিবেশের মধ্যে থেকে পরিবেশের উপাদানের সাহায্যে পরিবেশের জন্য শিক্ষা। এই পদ্ধতি পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। কোন কৃত্রিম পরীক্ষণ নয়, কোন কৃত্রিম পাঠ পরিকল্পনা নয়, শিক্ষার্থীরা সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গেপরিচিত হয়ে পরিবেশের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানবে, তাকে অনুভব করবে এবং সক্রিয়ভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করতে চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতির কার্যক্রম সম্বন্ধে নিচে একটি ধারণা দেওয়া হল পরিস্থিতি ভেদে এবং শিক্ষার স্তর ভেদে এই পদ্ধতি প্রয়োগের পরিকল্পনা এক এক ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে।

— চারপাশের ভূপ্রকৃতি, কৃষি, উদ্ভিদ, প্রাণী, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ধাপে ধাপে পরিচিতি লাভ করা।

— ঋতু বৈচিত্র্য, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি, নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা।

— চার পাশের জীবন যাত্রা প্রণালী, তার সমস্যা, ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

— ধীরে ধীরে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের সম্পর্ক অনুধাবন করার চেষ্টা করা। যেমন, উৎসব অনুষ্ঠানের বর্জ্য (ফুল, পাতা ইত্যাদি) স্থানীয় জলাশয়ে ফেলার রীতি জলাশয়ের কি ক্ষতি করে এই বিষয়ে অনুসন্ধান।

— সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা।

— অপচয় রোধ, বিকল্প ব্যবহার, বিকল্প শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

— স্থানীয় পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুধাবন, ইত্যাদি।

এই জাতীয় কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে শিক্ষককে এবং সেই সঙ্গে ডায়েরি তৈরি করা, প্রদর্শনী, বিতর্ক সভার

আয়োজন, বা অনুরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে সংহত করা দরকার। এই বিষয়টিকেই বলা হয়েছে পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা।

9.6 পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক শিখন (Environmental Awareness and Participatory Learning)

পরিবেশ সচেতনতা কাকে বলে তা নিয়ে দ্বিমত আছে। আক্ষরিক অর্থে পরিবেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সুপ্তচেতনার নাম পরিবেশ সচেতনতা। কিন্তু এই সুপ্ত চেতনা সমস্ত প্রাণিরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এর ফলে আমাদের নিজস্ব আচরণের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না বা পরিবেশের ভালো মন্দ নিয়ে বিশেষ কোন সক্রিয় চিন্তাও দেখা যায়না। এই কারণে আরও একটু নির্দিষ্ট ভাবে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

যদি বলা হয় যে সমস্ত মানুষের পরিবেশ সচেতনতা সমান নয়, অর্থাৎ পরিবেশ সচেতনতাকে একটি স্কেল হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তবে তার দুই চরম প্রাপ্ত বিন্দুতে দুই বিপরীত ধর্মী মানুষকে পাওয়া যাবে। একদিকের মানুষ পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, আর অন্যপ্রান্তের মানুষ এতটাই পরিবেশ সচেতন যে তাদের জীবন যাত্রা, চিন্তাভাবনা সবকিছুই আবর্তিত হয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এই দুই চূড়ান্তধর্মী মানুষের সংখ্যা খুব কম হলেও, অধিকাংশ মানুষ এই দুই মেরুর মাঝে কোনও না কোন বিন্দুতে অবস্থান করে। প্রশ্ন হল পরিবেশ সচেতন মানুষদের সঙ্গে কম পরিবেশ সচেতন মানুষের পার্থক্য কোথায়?

মনোবিজ্ঞানে বলা হয় মানুষের সমস্ত আচরণের পিছনে তিন ধরনের উপাদান কাজ করে—প্রজ্ঞামূলক (Cognitive), অনুভব মূলক (Affective) ও মনোসঞ্চালনমূলক (Psychomotor)। পরিবেশ সচেতনতাও একই ভাবে তিনটি উপাদান যুক্ত একটি মানসিক অবস্থা।

প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) — পরিবেশ সচেতন মানুষ তার চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে অনেক বেশি জানে, বোঝে, বিশ্লেষণ করতে পারে বা প্রতিটি ঘটনার বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারে। অন্যদিকে যারা পরিবেশ সম্বন্ধে কম সচেতন, তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে জানার বা বোঝার কোন ক্ষমতা বা প্রচেষ্টা থাকে না। তাদের প্রজ্ঞার জগতে পরিবেশ একটি নিষ্ক্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র মাত্র।

অনুভবমূলক (Affective) — পরিবেশকে জানার চেষ্টা করতে গিয়ে, পরিবেশ সচেতন মানুষ পরিবেশের প্রতিটি সংকেতের উত্তরে প্রতিক্রিয়া করতে চেষ্টা করেন এবং তার মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করেন। প্রতি ক্ষেত্রে এই আনন্দের অভিজ্ঞতা তাদের কাছে পরিবেশকে মূল্যবান করে তোলে, পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁদের একটা সামগ্রিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে যা শেষ পর্যন্ত মানুষের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

মনোসঞ্চালন মূলক (Psychomotor) — শুধুমাত্র পরিবেশকে ভালোবাসা বা পরিবেশের প্রতিটি ঘটনায় সাড়া দেওয়া নয়, পরিবেশ বান্ধব আচরণের দক্ষতা অর্জনও পরিবেশ সচেতন মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিষ্ক্রিয় আনন্দ লাভ নয়, পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যে ধরনের আচরণ করা দরকার সচেতন ব্যক্তি সেই ধরনের আচরণ নিজে করে এবং অন্যদেরও করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সুতরাং উপরোক্ত অর্থে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তোলা তবে বলা যায় যে পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ব্যক্তি,

- পরিবেশকে জানতে সচেষ্ট হবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও বোধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

- পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে।
- পরিবেশের ঘটনাবলীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- পরিবেশ বিষয়ক নানা তথ্য একত্রিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
- পরিবেশের নানা ঘটনার মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ধীরে ধীরে পরিবেশ সম্বন্ধে স্থায়ী আগ্রহ, ইতিবাচক প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ গড়ে তুলবে।
- পরিবেশ প্রসঙ্গে তার প্রেষণা সদা সক্রিয় থাকবে।
- পরিবেশ সহায়ক আচরণ ও দক্ষতা আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি ও আচরণ উদ্ভাবনে সর্বদা সচেষ্ট হবে।

কিন্তু উপরোক্ত অর্থে পরিবেশ সচেতনতা শুধুমাত্র ক্লাসের পড়া ও পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে বিকাশলাভ করবে না। তার জন্য দরকার অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা।

বিভিন্ন গবেষকরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সচেতনতা কোন কাজে লাগে না। অর্থাৎ এই জাতীয় সচেতনতা শেষ পর্যন্ত পরিবেশ বান্ধব আচরণে পর্যবসিত হয় না। শুধুমাত্র একধরনের সুপ্ত উচিত—অনুচিত বোধ হিসাবে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

মানুষ যখন পরিবেশ সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, তখন কিন্তু আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। অংশগ্রহণের ফলে তার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় তা ধীরে ধীরে মানুষকে আরও সক্রিয় করে তোলে। সেজন্য বনসৃজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করলেও একজন মানুষ খুব কমই বনসৃজনে যত্নবান হয়। কিন্তু যদি নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং নিজে বৃক্ষরোপণ করে চারা গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে তবে একটি গাছের প্রতি তার যে মমত্ববোধ জন্মায়, তা চিরস্থায়ী হয়ে অনুরূপ কাজে ক্রমাগত নিয়োজিত করে রাখে।

অংশগ্রহণের প্রকৃতি নানা ধরনের হতে পারে। যেমন,

পরিবেশ সহায়ক আচরণে অভ্যস্ত হওয়া— নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে জ্বালানি সাশ্রয়, জল অপচয় না করা, সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, প্লাস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার না করা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, শব্দ সৃষ্টিকারী কোন কাজ না কারা, জৈব সারযুক্ত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস, ইত্যাদি।

অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা— নিজে পরিবেশবান্ধব আচরণ করার পাশাপাশি পরিচিত অন্যান্যদেরও অনুরূপ আচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

পরিবেশ উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করা—বৃক্ষরোপণ ও পালন, জলাশয় সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করা, যানবাহন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ মেনে চলা, প্রাণি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

পরিবেশ বিনষ্টকারী কাজ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ—বন ধংস করার বিরোধিতা (যেমন, চীপকো আন্দোলন), জলাশয় ভরাট করার বিরোধিতা, অকারণ প্রাণি হত্যা ও নির্যাতন প্রতিরোধ, উদ্ভিদ, ফুল, ফল নষ্ট করার প্রতিরোধ, খাদ্য অপচয় প্রতিরোধ, অকারণ শক্তি ও সম্পদ অপচয়ের প্রতিরোধ ইত্যাদি।

পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণ—সভা, সমিতি, আলোচনাচক্র ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ. প্রচার, পদযাত্রা, প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করা পুস্তক, পোস্টার, নাটিকা, গল্প, ছড়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা।

আর্থিক অংশগ্রহণ—সাধ্যমত পরিবেশ বিষয়ক তহবিলে অর্থদান, অর্থ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যয় ইত্যাদি।

নেতৃত্বদান — শুধুমাত্র অনুগামী হিসাবে নয়, উপরোক্ত কাজগুলির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ও নেতৃত্ব দেওয়া, অন্যদের পরিচালিত করা।

গবেষণামূলক— পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, লৌকিক আচার আচরণের পরিবেশ বান্ধব ও বিরোধী বিষয়গুলি চিহ্নিত করার জন্য অনুসন্ধান, কোন স্থানীয় ঘটনার পরিবেশ সম্পর্কিত কারণ অনুসন্ধান (যেমন, অত্যধিক পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের দরুন শীতকালে সমস্ত পুকুর, জলাশয় শুকিয়ে যায়) ইত্যাদি।

প্রযুক্তমূলক—তথ্য প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তি যার যে বিষয়ে দখল আছে সেটিকেই পরিবেশের অনুকূলে কাজে লাগানোর চেষ্টা, বিকল্প তৈরির চেষ্টা (যেমন, বায়ো ডিজেল এখন স্বীকৃত বিকল্প জ্বালানি) এই সব।

এই সব কাজে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মানুষ সত্যিকারের পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠে। তবে সব মানুষই যে সমস্ত প্রকার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নয়; তার প্রয়োজনও নেই। এক বা দুই ধরনের কাজে অংশগ্রহণও যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

9.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

পাঠক্রম রচনার জন্য কোনও না কোন নীতি অনুসরণ করা দরকার। না হলে পাঠক্রম দিশাহীন হয়ে পড়ে। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার জন্যও বিশেষ কিছু নীতি আছে। সমন্বয়ের নীতি পাঠক্রম কথার অর্থ স্বাভাবিক ভাবে যে সব পাঠ্যসূচি পাঠক্রমে আছে তার মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক উপাদানগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পঠন পদ্ধতি। আর পাঠক্রম সম্প্রসারণ নীতিতে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় যা পরিবেশ শিক্ষার জন্য আবশ্যিক তা যুক্ত করে পাঠক্রম রচনা করা। পরিবেশ বিদ্যাকে একটি নতুন বিষয় হিসাবে পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়াও একধরনের পাঠক্রম সম্প্রসারণ পাঠক্রম সম্প্রসারণ আনুভূমিক ও উল্লম্ব এই দুই নীতি অনুযায়ী করা যেতে পারে। আনুভূমিক নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বয়স ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব পাঠ্যবিষয় কে সম্প্রসারিত করা হয়। আর উল্লম্ব নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়, সমস্ত নীতিরই কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে।

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে পৃথক কিছু নয়। সাধারণত কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর জোর দেওয়া হয় যেমন, সচেতনতা, জ্ঞান, প্রতিন্যাস, দক্ষতা ইত্যাদি। অন্যান্য নীতিগুলি মূলত সরাসরি পাঠক্রম রচনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ছাড়া আর কিছু নয়। পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্ন। প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরে যেহেতু বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয় সেহেতু পরিবেশ শিক্ষার নানা দিক মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পরিবেশ শিক্ষাও এই স্তরেই শুরু হয়। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে সমন্বয় ও সম্প্রসারণ এই দুই নীতিই অনুসরণ করা হয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষা ক্রমশ বিশেষজ্ঞধর্মী ও গবেষণা ধর্মী হয়ে ওঠে। স্কুল পর্যায়ে পরিবেশের মৌলিক বিষয় গুলি সম্বন্ধে জানা হয়ে যায় সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার এক একটি শাখা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিবেশ চর্চা করে থাকে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করে।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি গতানুগতিক ও আধুনিক দুই প্রকারই হতে পারে। প্রত্যেক প্রকার পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা বা অসুবিধা আছে। তবে প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব।

9.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) পাঠক্রমের সমন্বয় নীতি বলতে কি বোঝায়?

(খ) পাঠক্রমের সম্প্রসারণ কাকে বলে?

(গ) আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ঘ) পাঠক্রম রচনার জন্য জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যের দুটি উদাহরণ দিন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষা একটি আন্তর্বিদ্যা চর্চার বিষয় হিসাবে দেখা হয় কেন?

(চ) গণিতের মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষার একটি উদাহরণ দিন।

(ছ) পরিবেশ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব কি?

(জ) পরিবেশের ভৌত উপাদান কি?

(ঝ) নগরায়ণ জনিত সমস্যা কি?

(ঞ) উচ্চতর পরিবেশ শিক্ষা গবেষণাধর্মীস্তরের—কথাটির অর্থ কি?

(ট) বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

(ঠ) বক্তৃতা পদ্ধতির দুটি সুবিধা বলুন।

(ড) পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি কখন গতানুগতিক হয়ে ওঠে?

(ঢ) পরিবেশ চর্চার পদ্ধতি কি?

(ণ) পরিবেশ সচেতনতার প্রকৃত অর্থ কি?

(ত) অংশগ্রহণমূলক শিখন কাকে বলে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

(ক) পাঠক্রমের সমন্বয় উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(খ) আনুভূমিক ও উল্লম্ব নীতি কি? এই দুই প্রকার নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(গ) পাঠক্রম রচনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি কি?

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমে মাধ্যমিক স্তরের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষার ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

(চ) পরিবেশ শিক্ষায় প্রদর্শন পদ্ধতির উপযোগিতা কি?

(ছ) পরিবেশ শিক্ষায় সূচিবদ্ধ নিবিড় শিক্ষণ কতটা কার্যকর?

(জ) পরিবেশ চর্চার পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঝ) পরিবেশ সচেতনতা কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দিন।

(ঞ) অংশগ্রহণমূলক শিখন কাকে বলে? কেন একে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলা হয়?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতিগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করুন। উচ্চতর শিক্ষায় গবেষণার মাধ্যমে কিভাবে পরিবেশ সমস্যার জটিল রূপটি বোঝা যায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষায় পঠন পাঠনের পদ্ধতিগুলির বিবরণ দিন। কোন্ পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো এবং কেন?

(ঘ) পরিবেশ সচেতনতার ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার নীতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক 10 □ পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Training for Environmental Education)

গঠন

10.1 সূচনা

10.2 উদ্দেশ্য

10.3 শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

10.4 শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা

10.4.1 শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান

10.4.2 শিক্ষক শিক্ষণে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম

10.4.3 চাকুরির পূর্বে এবং পরে প্রশিক্ষণ

10.5 শিক্ষণ কৌশল

10.5.1 শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা

10.5.2 সমস্যার প্রতিকার

10.6 পরিবেশ শিক্ষণের সহায়ক উপকরণ

10.6.1 প্রথা সম্মত সহায়ক উপকরণ

10.6.2 আধুনিক সহায়ক উপকরণ

10.6.3 পরিবেশ শিক্ষার আরও কিছু সহায়ক আয়োজন

10.7 পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প

10.8 পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা

10.9 সারসংক্ষেপ

10.10 প্রশ্নাবলি

10.1 সূচনা (Introduction)

ইতিপূর্বে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম ও সাধারণভাবে কয়েকটি শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে সাধারণ শিক্ষায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা মানুষের দৈনন্দিন আচরণে তার প্রতিফলন ঘটার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষার ফলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ সচেতন হওয়া নয় যদি প্রতিটি মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়, যদি পরিবেশ প্রেম তাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে তবেই পরিবেশ শিক্ষা প্রকৃত সার্থক হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশ

শিক্ষার সার্থকতার জন্য দরকার সুদক্ষ শিক্ষক, যার অভাব বর্তমানে যথেষ্ট প্রকট। সুদক্ষ শিক্ষক তৈরি করার জন্য দরকার ব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

বর্তমান এককে পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। শিক্ষা তত্ত্বের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই হয়ত পরবর্তীকালে শিক্ষকশিক্ষণ কলেজে শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সেজন্য তাঁদের জানা দরকার প্রশিক্ষণের কিছু খুঁটিনাটি বিষয়।

10.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমাদের দেশে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষণ কৌশলগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প গ্রহণ, কার্যকর করা ও গবেষণা সম্বন্ধে প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করবেন।

10.3 শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need of Teacher Training in Environmental Education)

সাধারণভাবে শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্তমানে সকলেই কিছুটা অবহিত আছেন। অনেকেরই এই বিষয়ে কিছুটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র আছে, বিশেষত যাঁরা শিক্ষক শিক্ষণ বা অনুরূপ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নন। সেজন্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি কি সেগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার। সেই সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার জন্য দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে জানা দরকার।

একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও একজন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সঙ্গীত বিষয়ে কোনরকম প্রশিক্ষণ না নিয়েও অনেকে ভালো গান গাইতে পারেন এবং লোকের প্রশংসাও পেয়ে থকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন মানুষই বলবেন না যে সঙ্গীতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান প্রযোজ্য।

- শিক্ষক হওয়ার চারিত্রিক, বৌদ্ধিক ও বিদ্যাবত্তার মূল উপাদানগুলি সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছে। প্রশিক্ষণ সেই উপাদানগুলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে এবং সেগুলিকে পরিশীলিত করে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে। যেমন, সমস্ত মানুষই অন্য মানুষকে কিছু একটা জানানোর জন্য বক্তৃতা দিতে পারে, বর্ণনা করতে পারে বা করে দেখাতে পারে। কিন্তু একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক জানেন তিনি কোন উদ্দেশ্যে কোন কথাটি বলছেন বা কোন কাজটি করছেন এবং শ্রোতা বা দর্শকদের মধ্যে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে।
- প্রশিক্ষিত শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন। তিনি সেই অনুযায়ী তাঁর

নিজস্ব আচরণ ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তিনি জানেন কখন তার ছাত্রছাত্রীরা মনোযোগী বা অমনোযোগী, তাদের আগ্রহ ও প্রেষণা কতখানি আছে অথবা তার পরিবেশিত তথ্য ছাত্রছাত্রীরা কতটা মনে রাখতে পারছে। এই সচেতনতার জন্য তাঁর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

● প্রশিক্ষিত শিক্ষক নানা ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। সেজন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য বজায় রাখা, তার পক্ষে সহজ কাজ। তা ছাড়াও তিনি জানেন কোন পদ্ধতি কতটা কার্যকর। সেজন্য তিনি পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী তাঁর পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন।

● প্রশিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক একজন আত্ম জিজ্ঞাসু, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি ক্রমাগত তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, শ্রেণি কক্ষের আচরণ ও শিক্ষণ সম্পর্কিত আচরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। ভুল হলে দ্রুত সংশোধন করেন এবং কখনই নিজেকে চির অভ্রান্ত মনে করেন না।

● প্রশিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন। তিনি জানেন কোন্ পাঠাংশটি কি উদ্দেশ্যে তিনি পড়াচ্ছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্ভাব্য শিখনজনিত পরিবর্তনগুলি কি কি। এই জন্য তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি খুবই সুনির্দিষ্ট আচরণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। তিনি অল্পায়াসে অনেক বেশি শেখাতে পারেন।

● একজন দক্ষ শিক্ষক মূল্যায়নের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলি জানেন এবং প্রয়োগ করতে পারেন। সেজন্য একজন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের তুলনায় একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মূল্যায়ন সম্পর্কিত দক্ষতা অনেক বেশি। আর একথা সুবিদিত যে সঠিক মূল্যায়নের উপরই শিক্ষার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা দাঁড়িয়ে আছে।

● প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের আচরণ জনিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত। সেজন্য তাঁর পক্ষে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। আচরণজনিত সমস্যা দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষের পঠন পাঠনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে আবার সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য এই বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু উপরোক্ত প্রয়োজন ছাড়াও পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা সংযোজন করা দরকার। মনে রাখা দরকার উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) বিষয়ের শিক্ষকরাই একাধারে পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক, গবেষক ও প্রকল্পের (Project) রূপকার হিসাবে কাজ করেন। তাঁরা অনেকেই স্বপ্রশিক্ষিত বা উচ্চতর শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত (যেমন, UGC আয়োজিত নানা স্বল্পমেয়াদি কর্মক্রম, পরিবেশ মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় আলোচনা সভা, কর্মশালা ইত্যাদি)। ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রশ্নটি প্রাথমিক শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রসঙ্গেই সর্বাধিক আলোচিত হয়।

প্রথমত, পরিবেশ শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, যিনি অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষক (যেমন, জীববিদ্যা,ভূগোল বা ভৌতবিজ্ঞান) হিসাবে কর্মরত, তিনি নিজে যদি পরিবেশ সচেতন না হন তবে তাঁর পক্ষে সার্থকভাবে পরিবেশ শিক্ষার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের সময় আর পাঁচটা বিষয়ের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করলে প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হতে পারে।

পরিবেশ শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি পরিবেশ নির্ভর। সুতরাং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষক হয়ে ওঠেন না একজন পরিবেশবিদ গবেষক অনুসন্ধিৎসু উদ্যমী মানুষও তৈরি হন। এই জন্যই পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার আর একটি দিক হল পাঠক্রম সমন্বয়ের উপযোগিতা। বিদ্যালয় স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক এক একটি বিষয়ের পঠন পাঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ঐসব বিষয় ছাত্রছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে পড়তে অভ্যস্ত। ফলে নানা বিষয়ের মধ্যেকার যে যোগসূত্র, পারস্পরিক সম্পর্ক তা তাদের কাছে অপরিচিত থেকে

যায়। পরিবেশ শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা অনেকগুলি স্বতন্ত্র বিষয়ের মিলন ক্ষেত্র। সাধারণভাবে একজন শিক্ষক জ্ঞানের এই সংহত রূপটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও একজন পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে এমন ধরনের পরিবর্তন ঘটে যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ক্রমশ একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে পরিগণিত হন।

এই সমস্ত কারণে পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ এত গুরুত্বপূর্ণ।

10.4 শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (Present Status of Teacher's Training)

এখানে শিক্ষক শিক্ষণ কথাটিকে পরিবেশ শিক্ষার প্রশিক্ষক শিক্ষণ হিসাবে ধরতে হব। আমাদের দেশে শিক্ষাতত্ত্বের পাঠক্রম হিসাবে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই পরিবেশ শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকেই পরিবেশ মনোবিজ্ঞান (Environmental Pshychology) —মনোবিজ্ঞান গবেষণা ও পরে পঠন-পাঠনের বিষয় হিসাবে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের বিশেষ চর্চার বিষয় (Subject of Special Study) হিসাবে ঐচ্ছিক পাঠ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। পরিবেশ মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থও সেই সময় থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

যাইহোক ১৯৯০ সালের পর থেকে পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গটি ক্রমশ শিক্ষা বিজ্ঞানে গুরুত্ব পেতে থাকে। বিদ্যালয় স্তরে বাধ্যতামূলক ভাবে পরিবেশ শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার প্রস্তাব হলেও তা কার্যকর করতে অধিকাংশ দেশেই অনেকটা সময় চলে গেছে। এই কারণেই আনুষঙ্গিক ভাবে তখন থেকেই পরিবেশ শিক্ষাকে শিক্ষক শিক্ষণ-পাঠক্রমে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হতে আরও অনেকটা দেরি হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে, বিশেষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ স্তরে (বি.এড.), পরিবেশ শিক্ষাকে যুক্ত করার প্রাথমিক বিশেষজ্ঞ সুলভ পরামর্শ, পাঠ্য বিষয়ের রূপরেখা স্থির করা, এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (N.C.E.R.T.) বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বি. এড. পাঠক্রম যেহেতু উচ্চতর শিক্ষার আওতায় পড়ে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) নির্দেশিকা এবং আদর্শ পাঠক্রম (Model Syllabus) এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কিছুটা দিক নির্দেশ করতে সাহায্য করেছিল।

বর্তমানে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই বিষয়টি সকলের জন্য অবশ্য পাঠ্য। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমগুলি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়। সমস্ত রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ অথবা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (S.C.E.R.T.) অথবা রাজ্য সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ (West Bengal Board of Primary Education) বিষয়টির দায়িত্বপ্রাপ্ত। জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা (N.C.T.E.) শিক্ষক শিক্ষণের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের সময়কাল এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই বছর করা হয়েছে। এবং সমস্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

10.4.1 শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান (Institutes of Teacher Education)

শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থার প্রাথমিক আলোচনায় বলা হয়েছে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক এই দুই প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার কথা। পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে এই দুই প্রকার শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানে সমস্ত রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Primary Teachers' Training Institute) — প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (P.T.T.I) প্রত্যেক রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। NCTE'র অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষণ দেওয়া আইন সম্মত নয়, তাদের শংসাপত্রও গ্রহণযোগ্য নয়। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো NCTE অনুমোদিত হলেও সবসময় তা পরিবেশ শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। এর কারণ, NCTE পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করলেও এর জন্য স্বতন্ত্র কোন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেনি। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ও অন্যান্য সংস্থান অনুযায়ী শুধুমাত্র পরিবেশ শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা শিক্ষকতা করবেন, তাঁদের যোগ্যতার মান, কোন একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং বি.এড. ডিগ্রি। যদি তাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে অথবা বি.এড. পড়ার সময় পরিবেশ সংক্রান্ত কোন পাঠ না নিয়ে থাকেন তবে তাঁদের পক্ষে সার্থক পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষক তৈরি করা কষ্টকর।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বি.এড. পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার সংস্থান অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে খুব কমই প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক আছেন। এই সব বিচার করে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

—উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।

— অনেক বিষয়ের ভিড়ে পরিবেশ শিক্ষা একটি অন্যতম বিষয় মাত্র, যা স্কুল পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে অথবা জীবনের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পৃক্ত নয়। ফলে অনেকের দৃষ্টিতেই বিষয়টি গৌণ।

— পরিবেশ শিক্ষার জন্য, বিশেষভাবে পরিবেশ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করা হয় না।

— গ্রামের ও শহরের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। অর্থাৎ, গ্রামের পরিবেশ ও শহরের পরিবেশ ভিন্ন তাদের সমস্যার প্রকৃতিও ভিন্ন সেজন্য অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে সে সম্বন্ধে বহু শিক্ষকেরই কোন ধারণা নেই।

— পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়ন গতানুগতিকভাবে আর পাঁচটা পরীক্ষা নির্ভর বিষয়ের মত একই। এর ফলে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কিছু থাকে না। যান্ত্রিকভাবে রিপোর্ট তৈরি করা, ডায়েরি লেখা বা নমুনা সংগ্রহ বা অনুরূপ কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অনেক সময়ই পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে ওঠে না। লিখিত পরীক্ষার ধরন মুখস্থ করায় উৎসাহ দেয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Secondary Teacher's Training Institutes)—মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে কোন স্বীকৃত (UGC অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এড. পাঠক্রম অনুসরণ করে পঠন পাঠন হয় এবং শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্রছাত্রীরা বি.এড. ডিগ্রি লাভ করে। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেশের সমস্ত বি.এড. পাঠক্রম এক বৎসর সময় সীমার মধ্যে শেষ হয়। এই এক বৎসরের মধ্যে, তিন অথবা চারটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়, দুটি মাধ্যমিক পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশেষ পাঠ্য বিষয় এবং শিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষা শেষ করতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে পরিবেশ শিক্ষা বি.এড. পাঠক্রমে বিশেষ পাঠ্য বিষয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রতি বৎসর যত ছাত্রছাত্রী বি.এড. পরে তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পরিবেশ শিক্ষার পাঠ নিয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়নি। সুতরাং এখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানই প্রধান। এই সব প্রতিষ্ঠানেও পরিবেশ শিক্ষাদানের উপযোগী

শিক্ষকের অভাব আছে। মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের কলেজগুলিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও অনেক দুর্বলতা আছে। যেমন,

— পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী পরিকাঠামোর অভাব।

— সময়ের স্বল্পতার দরুন বিষয় বস্তুর প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করার সুযোগের অভাব।

— তাত্ত্বিক আলোচনার প্রাধান্য।

— ব্যবহারিক বা প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের সুযোগ কম।

— উৎসাহী এবং সুদক্ষ শিক্ষকের অভাব।

— পরীক্ষা নির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুযোগ না থাকা।

— যথেষ্ট ভালো বই ও অন্যান্য উপকরণের অভাব।

উপরোক্ত সমস্যা বা দুর্বলতাগুলি ছাড়াও আর একটি প্রধান সমস্যা, আমাদের দেশে একই পাঠক্রমের মাধ্যমে যাঁরা নবাগত অর্থাৎ যাঁরা ভবিষ্যতে শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন, এবং যারা ইতিমধ্যেই শিক্ষক হিসেবে কর্মরত—এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা লাভ করতে হয়। এর ফলে, দুই দলের মধ্যে পরিবেশ শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই ধরনের চিন্তা কাজ করে। যেমন, নবাগতরা যতটা খোলা মনে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টিকে গ্রহণ করেন, চাকুরিরত শিক্ষকরা যদি এমন বিষয় স্কুলে পড়ান যা পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তবে তাঁরা পরিবেশ শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব নাও দিতে পারেন।

10.4.2 শিক্ষক শিক্ষণে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম (Environemtnal Education Curriculum in Teacher Traning)

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম কেমন হবে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এই বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে বলে মনে করা হয়। যেহেতু পরিবেশ শিক্ষা নামক স্বতন্ত্র একটি বিষয় বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সেহেতু শিক্ষক শিক্ষণের যে অংশটিতে বিষয়বস্তু ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে (Content cum methods of teaching), পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম সেই অংশে রাখা হয়নি। আবার উপরোক্ত অংশের আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে শিক্ষণ পদ্ধতি (methods of teaching), পাঠ পরিকল্পনা (lesson planning) ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বর্জন করাও হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এই মডিউলের পাঠ্যসূচিতেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে পরিবেশ বিদ্যা, পরিবেশ শিক্ষার এবং পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এই তিনটি অভিমুখের মিশ্ররূপটিই বর্তমানে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমে লক্ষ করা যায়।

পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমগুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি যে কাঠামোটি ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ;

পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য (Information about Environment)

পাঠক্রমের এই অংশটিতে পরিবেশ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা, পরিবেশের উপাদান, উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় তথ্য, ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেওয়া হয়। এই অংশের পরিচ্ছেদগুলির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান (Knowledge) লাভ করায় সাহায্য করা।

পরিবেশ শিক্ষার পরিচয় (Introduction to Environemental Education)—এই অংশে পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা, গুরুত্ব, বিষয়বস্তু, পরিধি, নীতি পাঠক্রম এবং কখনও কখনও পরিবেশ শিক্ষার উদ্ভব ও ইতিহাস বিষয়ক

জ্ঞান লাভ করা উপযোগী তথ্যের সন্নিবেশ করা হয়। পরিবেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য জানার পর পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গেও পরিচিতি ঘটে শিক্ষার্থীদের।

পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতি (Methods of Teaching Environmental Education)—এই অংশটির উদ্দেশ্য পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতিগুলি, অথবা স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, পরিবেশ শিক্ষার সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হয়।

পরিবেশ শিক্ষার সহায়ক উপকরণ (Aids of Environemtnal Education)—যে সমস্ত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ পরিবেশ শিক্ষাকে সহজ ও সুগম করতে পারে তার সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া এই অংশটির উদ্দেশ্য।

বিস্তারিত পাঠ্যসূচি যাই হোক না কেন, পাঠক্রমের মূল কাঠামোটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমই। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পাঠক্রমে যতটা তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই তুলনায় ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বিশেষ কিছু নেই। তারফলে পাঠক্রমটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও সজীব হয়ে ওঠে না। বহু ছাত্রছাত্রীই, বিশেষভাবে যাঁরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেননি, তাঁরা পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টিকে নিছক আর একটি বিজ্ঞানের বিষয় মনে করে এড়িয়ে যান। এক কথায় শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার মত উপাদানের কিছুটা অভাব আছে।

10.4.3 চাকুরির পূর্বে ও পরে প্রশিক্ষণ (Pre-service and In-service Training)

ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরে চাকুরিরত এবং নবাগত এই দুই প্রকার শিক্ষার্থীর জন্য একই পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মানুযায়ী একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরাই নিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য শর্ত পূরণের সূত্রে অনেকে প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষকও নিযুক্ত হয়ে থাকেন এরা পরে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। এছাড়াও বহুপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা বহু আধুনিক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নন। পরিবেশ শিক্ষা এরকমই একটি বিষয়।

চাকুরিরত প্রশিক্ষণহীন ও পুরনো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য, স্বল্পমেয়াদি, কেন্দ্রীভূত এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যতটা কার্যকর, গতানুগতিক, দীর্ঘ মেয়াদি এবং অনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ততটাই নিষ্ফল। এই কথার তাৎপর্য এই যে, চাকুরিরতদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে, শুধুমাত্র পরিবেশ শিক্ষার জন্য স্বল্পমেয়াদি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তাঁরা পরিবেশ শিক্ষণে যতটা দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন, বর্তমান ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। নবাগত শিক্ষার্থীরা বর্তমান ব্যবস্থায় যতটা পরিবেশ শিক্ষার দক্ষতা অর্জন করেন, বি.এড. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বহু পরে তাঁদের কেউ কেউ যখন শিক্ষক হিসাবে কোন বিদ্যালয়ে যোগ দেন, তখন তত্ত্ব ও পরীক্ষা নির্ভর পরিবেশ শিক্ষা কোন কাজেই লাগে না।

এক কথায় পরিবেশ শিক্ষার জন্য বর্তমানে যে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে তা যথেষ্ট বাস্তব ও কার্যকর নয়। তার জন্য দরকার এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় শিক্ষণ ব্যবস্থা। এই কাজে শুধুমাত্র শিক্ষা বিভাগ নয়, পরিবেশ মন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রক সব কয়টিরই একযোগে কাজ করা উচিত।

10.5 শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

পূর্ববর্তী একটি এককে পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন সেই সব গ্রন্থকারদের অধিকাংশই প্রচলিত যত প্রকার শিক্ষণ পদ্ধতি আছে তার বিবরণ, সুবিধা ও অসুবিধার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা আসেন তাঁদের বর্তমান বা সম্ভাব্য

বৃত্তি শিক্ষকতা। তাঁরা বিদ্যালয়ে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন সেখানেই তাঁদের শিক্ষণ প্রাপ্তির সার্থকতা। সুতরাং সাধারণভাবে পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতি আর শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আগত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের কৌশল সম্পূর্ণ এক রকম নয়।

অন্যান্য গতানুগতিক পদ্ধতিগুলির পাশাপাশি যে কৌশলগুলি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ফলপ্রসূ হতে পারে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল,

প্রকল্প (Project) — প্রকল্প—পদ্ধতি হিসাবে শিক্ষায় একটি সর্বজন স্বীকৃত কৌশল, যা বহু শিক্ষাতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদের কাছে একটি উত্তম শিক্ষণ পদ্ধতি। এই কৌশলের মূলকথা প্রত্যক্ষভাবে, সক্রিয়তার মাধ্যমে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা লাভ করা। প্রকল্প একক বা ব্যক্তিগত এবং দলগত দুই প্রকারই হতে পারে। তবে একক প্রকল্প অপেক্ষা দলগত প্রকল্প অনেক বেশি কার্যকর এবং সমস্তভাবেই সুবিধা জনক। পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প গঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে। আপাতত এখানে এই কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া হল।

— শিক্ষার ক্ষেত্র শ্রেণিকক্ষ নয়, বাইরের পরিবেশ।

— তথ্যের উৎস পুস্তক বা শিক্ষক নয়, নিজের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ইত্যাদি।

— আগে তত্ত্ব, পরে উদাহরণ বা তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নয়, আগে তথ্য সংগ্রহ পরে তা থেকে তত্ত্বগঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

— প্রকল্প মনোগ্রাহী সক্রিয় শিক্ষা দান করে, নিষ্ক্রিয় ও বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে শিক্ষা নয়।

— সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করার দরুন নিজের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিযোজন ঘটে।

— শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কিভাবে পরিবেশ শিক্ষা দেবেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে।

— প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে দলগত সংহতি, নিজস্ব চিন্তা, যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পরিবেশের প্রতি সম্পর্ক দৃঢ় হয়। পরিবেশ শিক্ষার জন্য এই পদ্ধতি বা কৌশল উৎকৃষ্ট।

সমস্যা সমাধান (Problem Solving) — পরিবেশ সংক্রান্ত কোন নির্বাচিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিবেশ শিক্ষালাভ করার পদ্ধতিও অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতিও মনোবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বে—একটি স্বীকৃত কৌশল। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ধাপগুলি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল—

(ক) সমস্যা চিহ্নিত করণ (To identify the problem)—পরিবেশ সম্পর্কিত কোন সমস্যাকে বেছে নেওয়া। যেমন, শহরাঞ্চলে পেয় জলের (Potable water) অপচয়।

(খ) সমস্যার সংজ্ঞাদান (Defining the problem)—সংজ্ঞাদান কথাটির অর্থ সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করা। যেমন, পেয় জল কাকে বলা হবে বা অপচয় বলতে কি বোঝায়। শুধু মিউনিসিপ্যালিটি যে জল সরবরাহ করে, না অন্যান্য পেয় জলের উৎসও সমস্যার মধ্যে ধরা হবে? অপচয় বলতে শুধুমাত্র পান করা ছাঁড়া আর সব কিছুই বোঝানো হবে না গৃহস্থালির যে কোন কাজকেই সদ্ব্যবহার হিসাবে গণ্য করা হবে?

(গ) সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় (Determining the nature of the Problem)— সমস্যার ব্যাপকতা, সমস্যার নানা দিকগুলি এবং সমস্যার জটিলতা বিশ্লেষণ করে সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করা। যেমন, সমস্ত অঞ্চলেই জলের অপচয় হয়, না অঞ্চল বিশেষে? মাথাপিছু জল ব্যবহারের পরিমাণ, জল সরবরাহের পরিমাণ, লীকেজ (Leakage) বা অনুরূপ কারণে অপচয়, ভিন্ন উদ্দেশ্যে জলের ব্যবহার ইত্যাদি যত রকম দিক সমস্যাটির সঙ্গে যুক্ত সেগুলি বিশ্লেষণ করা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন।

(ঘ) সমস্যার সম্ভাব্য কারণ (Probable cause of the problem) উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করা।

(ঙ) সমাধানের উপায় নির্ধারণ (To find solution of the problem)— যতরকম সমাধান সম্ভব সেগুলি নির্ধারণ করা এবং তাদের তুলনামূলক বিচার করা।

(চ) সমাধানের উদ্যোগ (Efforts towards solution)—সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

(ছ) ফলাফলের বিচার (Review of results)—পূর্বোক্ত উদাহরণের বেলায় জল অপচয় কতটা কম বা ব্যবহারকারীদের অভ্যাসে কতটা পরিবর্তন হয় তার বিচার করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় থেকে একটু ভিন্ন। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এমন নয় যে একবার সমাধান হলে কাজ শেষ হয়ে যায়। অথবা অন্যভাবে বলা যায় কখনই এই সব সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। সেজন্য এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিক ভাবে চলতেই থাকে। সমস্যার সংজ্ঞাদান, সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়, সমস্যার সম্ভাব্য কারণ বিচার প্রভৃতি ধাপগুলির মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক তাত্ত্বিক শিক্ষাও হতে পারে। সেজন্য এই ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবেশ শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী।

কার্যকরী গবেষণা (Action research)—পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে কার্যকরী গবেষণাও একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রায় সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অনুরূপ কারণ কার্যকরী গবেষণাও কোন একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হয়। এক্ষেত্রে গবেষণার পদ্ধতিগত নীতিগুলি কঠোর ভাবে অনুসরণ করার দরুন আরও সুনির্দিষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়। তাছাড়াও পরীক্ষামূলক ভাবে কোন পদক্ষেপ নিয়ে তার ফলাফল বিচার করার সুযোগও এখানে থাকে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বৃহৎ এবং ব্যাপক। কার্যকরী গবেষণার জন্য ঐ সমস্যাকে অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে নিয়ে গবেষণার উপযোগী সমস্যা নির্বাচন করা হয়। যেমন,

— নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে মধ্য বা উচ্চবিত্ত মানুষের জল ব্যবহারের পরিমাণের পার্থক্য ও তার কারণ নির্ণয়।

— জল সরবরাহকারী কর্মীদের সন্তুষ্টির (Job satis/faction) সঙ্গে মেরামতি কাজের গতি ও জল অপচয়ের সম্পর্ক।

— পরিবেশ সচেতনতা ও জল সম্পদ বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে জল ব্যবহার প্রবণতার সম্পর্ক, ইত্যাদি।

এইসব উদাহরণ কার্যকরী গবেষণার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য নমুনা মাত্র। প্রকৃত সমস্যা আরও সুনির্দিষ্ট যুক্তিনির্ভরভাবে নির্বাচন করা হয় এবং তা সংখ্যায় অনেক হতে পারে। অনেকগুলি গবেষণালব্ধ ফল একত্রিত করে সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সমস্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে।

10.5.1 শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা (Problems related to teachers' Training)

শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ শিক্ষার আয়োজন ও সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সমস্যা। সামগ্রিক ভাবে কিছু কিছু দুর্বলতা ও সমস্যার কথা ইতিপূর্বে শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও কিছু সমস্যা এখানে তুলে ধরা হল।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব—আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে বাদ দিলে পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এই কারণে যাঁরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষঠানের সঙ্গে যুক্ত তারা যতটা পাঠক্রম ও পরীক্ষার দাবি সম্বন্ধে তৎপর, পরিবেশ সচেতনতার ভিত্তিতে নিজস্ব তাগিদে পরিবেশ শিক্ষার পঠন পাঠনে ততটা তৎপর নন। সেজন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠায় প্রবল বাধা সৃষ্টি হয়, পরিবেশ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সার্থক হয় না।

শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা— শুধুমাত্র প্রেষণার অভাব নয়, পরিবেশ শিক্ষণের সঠিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সমাজ সেবামূলক (Social Service or Community Service) জাতীয় কিছু কিছু গৌণ বিষয় রাখা হয় যা খুব গুরুত্ব সহকারে না দেখায় নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হয়। এই বিষয়ে যে সব কার্যক্রম নেওয়া হয়, তাতে পরিবেশ শিক্ষার উপাদান বিশেষ কিছু থাকে না।

শিক্ষক শিক্ষণকে জাতীয় স্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে কোন জাতীয় কর্মসূচি নেই। কোন জাতীয় নীতি অথবা কর্মসূচি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে রাজ্যস্তরে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কোন অর্থবহ কার্যক্রম হাতে নেওয়া কঠিন, এরকম কার্যক্রম বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া হলেও তার ফলাফল যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে না।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে দেশের খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথেষ্ট কম, ভালো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও কম।

দেশের পরিবেশ নীতির সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার কোন সামঞ্জস্য নেই। অর্থাৎ পরিবেশ দপ্তর ও মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই।

অন্যান্য পরিকাঠামো, উপযুক্ত শিক্ষক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

10.5.2 সমস্যার প্রতিকার (Remedies of the Problems)

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান একান্ত অসম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

- পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক তৈরি করার জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে অথবা বর্তমান পরিবেশ নীতির মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়টিকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে হবে।

- পরিবেশ দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দিতে হবে।

- জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎকে এই বিষয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (S.C.E.R.T.) ও জেলা স্তরে জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (D.I.E.T.) গুলিকে নেতৃত্বদাতা সংস্থা (Nodal agency) হিসাবে কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। প্রথমে রাজ্য ও জেলা স্তরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক তৈরি করে তারপর এক একটি বিদ্যালয় গুচ্ছের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- রাজ্য স্তরেও বিভিন্ন মন্ত্রক, শিক্ষা পর্ষৎগুলির (মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ইত্যাদি) মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিদ্যালয় পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার জন্য অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ করতে হবে এবং সেই মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিকভাবে এর সূচনা হয়েছে।

● পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দ ও তার সদ্ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে অনুরূপ গুরুত্ব ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে পরিবেশ শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ পরিবেশ শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। অনেক সময় অর্থ বরাদ্দ করা হলেও তা ব্যবহার সম্বন্ধে অস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকায় তার অপচয় হয়। সে জন্য আগে শিক্ষক তৈরি করে তারপরে অথবা একই সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রীয় স্তরেই।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়কেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কার্যকর পরিবেশ শিক্ষা সম্ভব নয়।

10.6 পরিবেশ শিক্ষণের সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids in Environmental Educations)

উপরোক্ত আলোচনায় যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের জন্যও পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো দরকার। পরিকাঠামোর প্রধানতম উপাদান হল শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের উপযুক্ত আয়োজন করা।

10.6.1 প্রথাসম্মত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Conventional Teaching Aids)

এই জাতীয় শিক্ষক সহায়ক উপাদানগুলি অধিকাংশই অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এদের সাধারণভাবে এক কথায় দৃশ্য ও শ্রাব্য সহায়ক (Audio-visual Aids) বলা হয়। প্রধানত এই উপকরণগুলি বক্তৃতাধর্মী শিক্ষণ পদ্ধতির Lecture based teaching methods) সঙ্গে সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চার্ট ও মডেল (Charts and Models)— কোন কিছুর ছবি, তালিকা অথবা মডেলের সাহায্যে যে সব বিষয়ের বর্ণনা বিষয়টির ধারণা সম্পূর্ণ করতে পারে না সেই সব বিষয়ের ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চার্ট, মডেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ বিষয়ক চিত্র, ফটোগ্রাফ (স্থির), মডেল ইত্যাদি পরিবেশ শিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। অনেক সময় এই সব উপকরণ শিক্ষক নিজেই অথবা ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করে নিতে বা সংগ্রহ করতে পারে।

প্রোজেক্টার, স্লাইড প্রোজেক্টার, ফিল্ম স্ট্রীপ ইত্যাদি (Projector, Slide projecter, Film strip etc.)— এইগুলি বিশেষজ্ঞ নির্মিত এবং চার্ট মডেলের উন্নততর সংস্করণ। তবে চার্টও মডেল অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয়। অনেক বিষয় পরপর প্রোজেক্ট করা যায় কিন্তু চার্ট বা মডেল প্রদর্শিত বিষয়ের সংখ্যা খুবই সীমিত। তবে এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর দেখা ও শোনা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে দীর্ঘ সময় ধরে এগুলি দেখালে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও মনোযোগ কমতে পারে, ক্লান্তি আসতে পারে।

চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, ভিডিও এবং ভিডিও সি.ডি. (Movie, Documentary, Video and Video CD)—এই সব শিক্ষা সহায়ক উপকরণ খুবই আকর্ষণীয়। সচল এবং রঙীন হওয়ার দরুন এগুলি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়কে তুলে ধরতে পারে। শিক্ষকের বক্তৃতার বিকল্প হিসাবে কোন ভাষ্যকার মনোগ্রাহী কণ্ঠে বর্ণনা দিতে পারেন, যা ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগের ঘাটতি হতে দেয় না। এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে, আলাদা ভিডিও টেপ অথবা সি.ডি. তৈরি করে রাখলে সেগুলি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং বার বার ব্যবহার করা যায়।

উপরোক্ত সহায়ক উপকরণগুলিকে প্রথা সম্মত বলার কারণ এগুলি ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীরা থাকে নিষ্ক্রিয়। চলচ্চিত্র, ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শন শেষ হলে শিক্ষক যদি কোন আলোচনার সূত্রপাত করেন তবে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নোট নিতে পারে। কিন্তু প্রদর্শনের সময় তাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। আরও আধুনিক ব্যবস্থায় এই ত্রুটি দূর করা যায়।

10.6.2 আধুনিক সহায়ক উপকরণ (Modern Aids)

মিথষ্ক্রিয়া ভিত্তিক বহুমাধ্যম ব্যবস্থা (Interactive multimedia system)—চলচ্চিত্র ইত্যাদি উপকরণে যেহেতু দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই প্রকার উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় সেহেতু একদিক থেকে দেখতে গেলে এগুলিও বহুমাধ্যম ব্যবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু কম্পিউটার ভিত্তিক বহুমাধ্যম ব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের কী বোর্ড ব্যবহার করে ইচ্ছামত তথ্যের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদের ক্ষমতা ও সুবিধামত শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়াই শিখতে পারে। নিষ্ক্রিয়তা না থাকায় এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক। কিন্তু এই ব্যবস্থা সহজ ও সর্বত্র লভ্য নয় এবং ব্যয় বহুল।

অন্তর্জাল (Internet, Website)—তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বর্তমান ছাত্রছাত্রীরাও অনেকেই দক্ষ হয়ে উঠছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন তথ্য শিক্ষার্থীরা পছন্দমত কম্পিউটারের পর্দায় দেখে নিতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টি ব্যক্তি নির্ভর এবং কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়াই সম্ভব। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

এছাড়াও টেলিভিশনে ডিসকভারি (Discovery), ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক (National Geographic), অনিম্যাল প্লানেট (Animal Planet) প্রভৃতি চ্যানেলেও পরিবেশ শিক্ষার সহায়ক উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এদের পরিকল্পিত ব্যবহার সম্ভব নয়।

10.6.3 পরিবেশ শিক্ষার আরও কিছু সহায়ক আয়োজন (Some more Aids for Environmental Education)

এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হবে। এইগুলিকে শিক্ষণ পদ্ধতি বলা যায় না আবার শিক্ষা সহায়ক উপকরণও বলা যায়না। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হল।

প্রদর্শনীর আয়োজন (Arranging Exhibition— কোন প্রদর্শনীতে যোগদান করা বা প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পরিবেশ বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলে তা পরিবেশ শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। প্রদর্শনীর আয়োজন করা কথাটির অর্থ এই নয় যে শিক্ষকের নির্দেশমত কিছু মডেল, চার্ট ইত্যাদি সাজিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। শিক্ষকের নেতৃত্বে হলেও সর্বস্তরে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে নিজেদের উদ্যোগে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে পরিবেশ শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ অথচ ফলপ্রসূ মাধ্যম পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর বিষয় নির্বাচন (Theme), পরিকল্পনা, প্রদর্শনীর দর্শনীয় বিষয়গুলি স্থির করা, সেগুলি সংগ্রহ করা এবং তৈরি করা, প্রদর্শনীর সাজ সজ্জা, প্রদর্শকদের (Demonstrater) তৈরি করা এবং সবশেষে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা এই সব স্তরেই ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমেই পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতা আসতে পারে।

এই সঙ্গে পরিবেশ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ, দেওয়াল পত্রিকা, আলোচনা চক্র ও বক্তৃতার আয়োজন করলে তা আরও বেশি ফলপ্রসূ হয়। আকস্মিকভাবে কোনও এক বছর এই জাতীয় পরিকল্পনা না নিয়ে নিয়মিত বাৎসরিক পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন হলে পরিবেশ শিক্ষার ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursion)—শিক্ষামূলক ভ্রমণ খুব অপরিচিত বিষয় নয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই শিক্ষামূলক ভ্রমণ যতটা ভ্রমণের আনন্দ পাওয়ার জন্য আয়োজন করা হয় শিক্ষামূলক দিকটা ততটাই অবহেলিতও থাকে। যদিও বিশেষ বিশেষ পাঠ্য বিষয়, যেমন, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক নয়। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। বৃক্ষচ্ছেদন, অরণ্য লোপ ও ভূমিক্ষয়ের প্রসঙ্গটি উপযুক্ত স্থানে ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে যতটা সহজে বোঝা যায় আর কোনভাবেই সেটা সম্ভব নয়। এই-ধরনের অসংখ্য বিষয় আছে যা শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজন করে আনন্দ ও পরিবেশ শিক্ষাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা কিছুটা সীমিত কারণ, সকলের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়না। তাছাড়াও ভ্রমণ, ক্যাম্প ইত্যাদি ব্যয় সাপেক্ষ এবং সমস্ত কিছুই ভ্রমণের মাধ্যমে শেখানো সম্ভব নয়।

10.7 পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প (Projects on Environmemtal Education)

প্রকল্প কথাটির দুই প্রকার অর্থ। প্রকল্প একটি শিক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রকল্প হল ক্ষেত্র নির্ভর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক স্ব-শিখন প্রক্রিয়া। উভয় প্রকার অর্থের মধ্যে, কোন বিরোধ নেই। কারণ স্বশিখন হলেও সেটি একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত সার্থক শিক্ষণ পদ্ধতি। প্রকল্প ও গবেষণার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রকল্প তৈরি করা অথবা প্রকল্পের মাধ্যমে কোন গবেষণামূলক সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া বিরল নয়। সেজন্য এই জাতীয় পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়। সংক্ষেপে প্রকল্পের ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল।

- প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন— অর্থাৎ প্রকল্পের মাধ্যমে কোন্ বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হবে তা স্থির করা।
- প্রকল্পের ক্ষেত্র নির্বাচন— অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্র (Field) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, সূত্র, পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয় পাওয়া যাবে তা নির্বাচন।
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি— কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।
- তথ্য সংকলন— কিভাবে প্রাপ্ত তথ্যের সংকলন করা হবে। গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণবাচক (Quantitative) তথ্য থাকলে সেগুলি কিভাবে সংকলন করা হবে।
- তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ— তথ্যগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে নেওয়া।
- সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রিপোর্ট তৈরি করা।

এখানে কয়েকটি পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া হল।

১। অঞ্চল বিশেষে শব্দ দূষণের পরিমাণ ও তার প্রভাব।

২। জ্বালানি ব্যবহারের অভ্যাস ও বায়ুতে বিভিন্ন দূষণের মাত্রা ও তার প্রভাব।

৩। কৃষিক্ষেত্র সন্নিহিত জলাশয়ে জলে জলজ প্রাণিদের উপস্থিতি ও তার পরিবর্তন।

৪। বন সৃষ্টির প্রভাবে স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার পরিবর্তন।

৫। উন্নয়ন ও তার প্রভাবে মানুষের সহিষ্ণুতার পরিবর্তন।

বলা বাহুল্য উদাহরণগুলি কাল্পনিক নমুনা মাত্র। প্রকৃত প্রকল্প শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নির্বাচন করা দরকার।

10.8 পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা (Research in Environmemtal Education)

পরিবেশ বিদ্যার (Environemntal Studies) এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিবেশ বিষয়ক গবেষণার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচেষ্টা বেশি দেখা যায়না। এর কারণ এখনও শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষকশিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে নি এবং ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে নি। অথচ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে পারে না।

পরিবেশ শিক্ষা সক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রাধান্য বেশি।

১। বিদ্যালয়ে পাঠ্য জীবন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিকাশ।

২। ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সচেতনতা পরিমাপ করার উপযোগী প্রশ্নোত্তরিকা নির্মাণ ও তার ব্যবহার।

৩। পরিবেশ শিক্ষার প্রতি শিক্ষকদের প্রতিন্যাস ও তার প্রভাব।

৪। পরিবেশ সম্পর্কিত প্রেষণার পরিমাপ।

৫। পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ সক্রিয়তার (প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে) সম্পর্ক নির্ণয়।

৬। স্নাতক স্তরে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষার প্রভাবে পরিবেশ সচেতনতার পরিবর্তন।

৭। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম পর্যালোচনা।

এই ধরনের আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। এই বিষয়ে আরও ব্যাপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

10.9 সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিবেশ শিক্ষার অপরিহার্যতার অনেক কারণ আছে। এই সব কারণের মূল কথা পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে মানুষের আচরণ পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশ সমস্যা দূর করায় এবং পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে। কিন্ত পরিবেশ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এর কারণ উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তাতে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই পাঠক্রমের মেয়াদ দুই বৎসর হওয়ায় কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু বি.এড. কলেজ গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় এবং স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাতত্ত্বের পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা একটি ঐচ্ছিক বিষয়। সেজন্য খুব কম ছাত্রছাত্রীই পরিবেশ শিক্ষাগ্রহণ করে। এর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব যথেষ্ট।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণের জন্য সাধারণত গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে অনুপযুক্ত। প্রকৃত কার্যকর শিক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে শিক্ষণ সংক্রান্ত অনেক সমস্যা আছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা, জাতীয় স্তরে উপযুক্ত নীতির অভাব ইত্যাদি সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এই সব সমস্যার প্রতিকার অসম্ভব নয়। বিভিন্ন মন্ত্রকগুলির মধ্যে সমন্বয়, সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনা, শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দান, ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যার প্রতিকার সম্ভব।

শিক্ষক শিক্ষণের ও পরিবেশ শিক্ষার সহায়ক উপকরণ ও আয়োজন সার্থক শিক্ষক শিক্ষণের অন্যতম শর্ত। এইসব আয়োজনের অন্যতম প্রদর্শনীর আয়োজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি। পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা এখনও খুবই সীমাবদ্ধ বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ।

10.10 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের মধ্যে একটি পার্থক্য বলুন।

(খ) পাঠক্রম সমন্বয়ের উপযোগিতা কি?

(গ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণে NCERT'র ভূমিকা কি?

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলি কি কি?

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হওয়ার ফল কি?

(চ) চাকুরির পূর্বে এবং পরে একই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকায় কোন্ সমস্যা সৃষ্টি হয়?

(ছ) প্রকল্প কাকে বলে?

(জ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রথম ধাপটি কি?

(ঝ) ঐ পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপ কি?

(ঞ) কার্যকরী গবেষণা কাকে বলে?

(ট) শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কি বোঝায়?

(ঠ) পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষণের জন্য জাতীয় নীতি দরকার কেন?

(ড) চার্ট, মডেল প্রভৃতিকে প্রথা সম্মত সহায়ক উপকরণ বলা হয়েছে কেন?

(ঢ) চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে সক্রিয় হতে পারে?

(ণ) বর্তমান শিক্ষা গবেষণার দুটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করুন।

(খ) শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা দিন।

(গ) চাকুরির পূর্বে ও পরে শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষণ কৌশল হিসাবে প্রকল্পের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) সমস্যা সমাধান মূলক পদ্ধতি কি? নিজস্ব একটি উদাহরণ দিন।

(চ) শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির পরিচয় দিন।

(ছ) শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ হিসাবে চলচ্চিত্র, ভিডিও ইত্যাদির উপযোগিতা কি?

(জ) আধুনিক শিক্ষণ সহায়ক উপকরণগুলির পরিচয় দিন।

(ঝ) পরিবেশ শিক্ষা, প্রদর্শনীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

(ঞ) পরিবেশ শিক্ষা গবেষণার উপযোগিতা ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের কৌশলগুলি কি কি? সংক্ষেপে কৌশল গুলির পরিচয় দিন ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আলোচনা করুন ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে উল্লেখ করুন।

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের সহায়ক উপকরণগুলি আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণের জন্য প্রদর্শনী ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিষয়টি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(চ) যে কোন একটি সমস্যা নির্বাচন করে সমস্যা সমাধানমূলক শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা রচনা করুন।

(ছ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(অ) বর্তমান পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা, (আ) কার্যকরী গবেষণা (ই) প্রকল্প, (ঈ) শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম।